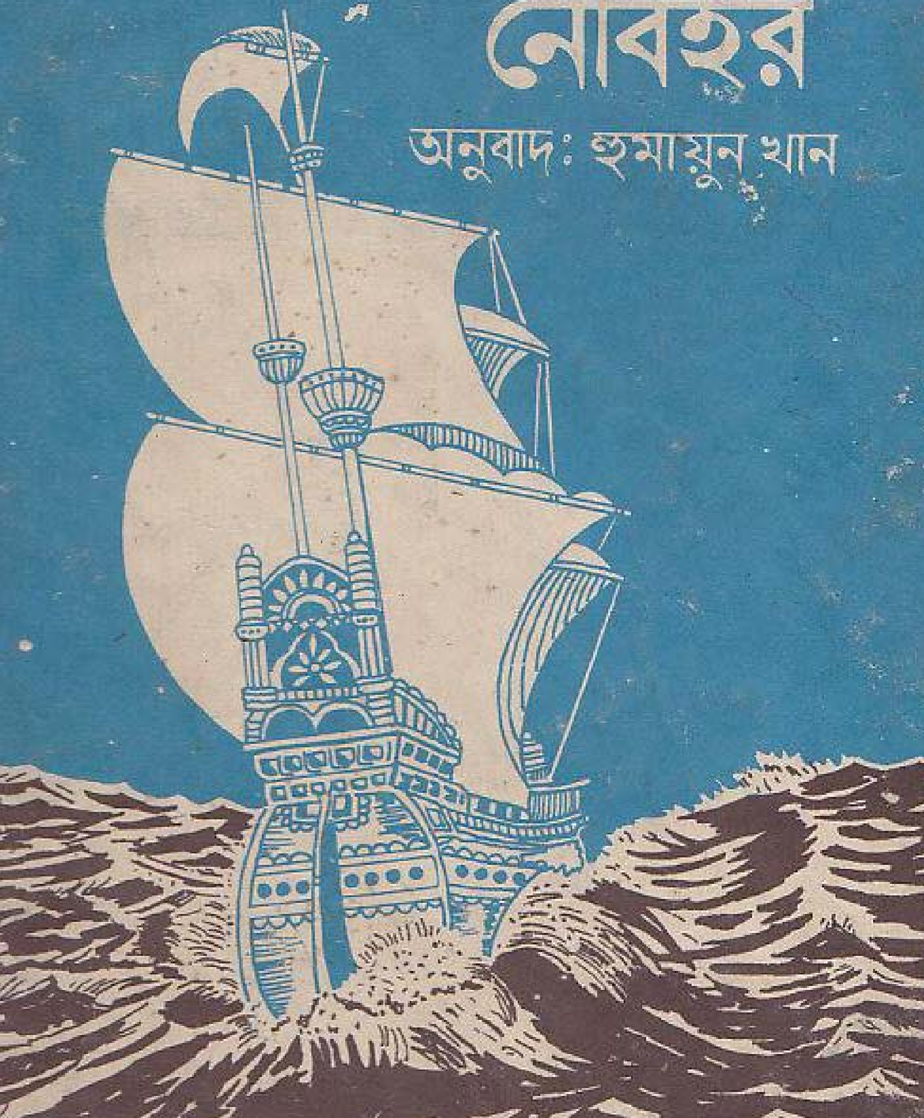
সৈয়দ সুলায়মান নদভী

আরব নৌবহর

অনুবাদ: হুমায়ুন খান



আল্লামা সৈয়্যদ সুলায়মান নদভী

আরব নৌবহর

অনুবাদ
হুমায়ুন খান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আরব নৌবহর
মূল : আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী
অনুবাদ : হুমায়ূন খান
ই.ফা.বা প্রকাশনা : ৯৪৯
ই.ফা.বা গ্রন্থাগার : আরব ইতিহাস, নৌবহর : ৯৫৩

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৮২

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫
জুন ১৯৮৮
শাওয়াল ১৪০৮

প্রকাশক
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা—১০০০

প্রচ্ছদ
দেলোয়ার হোসেন

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশ দাস লেন, ঢাকা

বাঁধাইয়ে
ওরিয়েন্টাল বাইন্ডার্স
৮৭, রেবতী মোহন দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা

মূল্য : আঠার টাকা মাত্র

ARAB NAUBAHAR : The Aarb Navigation, written by Allama Syed Sulaiman Nadvi in Urdu, translated into Bengali by Humayun Khan and published by Abu Saeed Muhammad Omar Ali, Director of Publication, Islamic Foundation Bangladesh Baitul Mukarram, Dhaka—1000 June 1988

Price Tk. 18·00 U. S. Dollar : 1·00

প্রকাশকের কথা

বিশ্ব সভ্যতায় আরব তথা মুসলমানদের বিরাট অবদান আজ বিস্মৃতির অন্তরালে চাপা পড়ে গেলেও এ কথা নির্মম সত্য যে, একদিন বিশ্ব সভ্যতার নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল মুসলমানরাই। সভ্যতার অন্যান্য ক্ষেত্রের সংগে সংগে সেদিন নৌ-বিজ্ঞান ও সমুদ্র বিজ্ঞানেও আরবরা ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই আরবরা ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৌ-বাণিজ্যের ক্ষেত্র যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হন। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশের সংগে ইসলামের সর্বপ্রথম যোগাযোগ ঘটে আরব সওদাগরদের মাধ্যমে —যাঁরা সমুদ্রপথে এসব দেশে আগমন করেছিলেন। আজও নৌ-বিজ্ঞানের ব্যবহৃত অসংখ্য শব্দের আরবী উৎস এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

কিন্তু একদিন যা ছিল ইতিহাসের বাস্তব সত্য আজ দুর্ভাগ্যক্রমে তাকে পরিকল্পিতভাবে বিস্মৃতি ও পরিচয়ের অন্তরালে চাপা দেওয়া হয়েছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত গবেষক সৈয়দ সুলায়মান নদভী এই চাপা পড়া ইতিহাসের খানিকটা পুনরুদ্ধার করে সুধী সমাজের কাছে গ্রন্থখানি পেশ করে মুসলিম উম্মাহ্‌র নবতর আত্মপরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছেন। ১৯৮২ সালে প্রথম আমরা তাঁর এ মহামূল্য গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করি। বর্তমানে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো শুকরিয়া জানাচ্ছি।

অনুবাদকের কথা

বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (রঃ) (ওফাত ১৯৫৩ ইং) বোম্বাই-এর ইসলামিক রিসার্চ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৯৩১ সালে এই লিখিত বক্তৃতামালা পেশ করেন। আরব নাবিকগণের দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযান, বিপদসংকুল নৌ-জীবন ও নৌ-বিজ্ঞানে তাঁদের অবদান সম্বন্ধে এই গবেষণার জন্যে তিনি বিপুল প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর ছাত্র এবং ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় দারুল মুসান্নিফীন শিবলী একাডেমীর যুগ্ম সচিব সৈয়দ শাহাবুদ্দীন আবদুর রহমান সে বক্তৃতামালা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং তা প্রথমে দাক্ষিণাত্য হায়দ্রাবাদের 'ইসলামিক কালচার' ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত হয়, পরে ১৯৬৪ সালে বই আকারে বের হয়। আমি সে ইংরেজী বই থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছি।

আজকের বিশ্ব সভ্যতার অগ্রগতিতে মুসলমানদের, বিশেষ করে আরবদের, অবদান কতটুকু তা আমরা অনেকেই সঠিকভাবে জানি না। নৌ-বিজ্ঞানে, সমুদ্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে জাতিতে-জাতিতে সুসম্পর্ক স্থাপনে আরবদের অবদান কতটুকু আল্লামা সুলায়মান নদভী (রঃ)-এর অতি মূল্যবান এই বইটি পড়লে তা জানা যাবে। কুরআন শরীফের উদ্ধৃতিসমূহ আমি সৈয়দ শাহাবুদ্দীন আবদুর রহমান কৃত ইংরেজী থেকে যথাসাধ্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাংলায় অনুবাদ করেছি।

ঢাকা
রমযান ১৪০১ হিঃ
জুলাই ১৯৮১ ইং

হুমায়ুন খান

উৎসর্গ

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সাধারণ পাঠাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক,
ইসলামিক একাডেমীর (ফাউন্ডেশন) সাবেক পরিচালক
জনাব আহ্‌মদ হোসাইন সাহেবের হাতে

অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে

হুমায়ুন খান

সূচীপত্র

ভূমিকা

আরব দেশটি তিনদিকে সমুদ্রবেষ্টিত, পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর আর পশ্চিমে লোহিত সাগর। এ কারণেই হিজরীর প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের সাহিত্যে একে 'জাযিরাতুল আরব' বা আরব দ্বীপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এর সমুদ্র-সীমা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইয়ামান ও অন্যান্য উপকূলবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র আরবদেশ শুষ্ক, বিরান জমি। সে কারণেই, এরূপ দেশের অধিবাসীরা যে অবশ্যই ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি ঝুঁকে পড়বে তা স্বাভাবিক। তাই দেখা যায় যে, ইতিহাসের একেবারে শুরু থেকেই আরবরা নৌ-বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছে। ঈসা (আঃ)-এর জন্মেরও প্রায় দুই হাজার বৎসর আগে হযরত ইউসুফ (আঃ) যে কারাভাঁর সংগে মিসরে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আরব সওদাগরও ছিল।[১] স্মরণাতীতকাল থেকে আরবরা স্থল ও জল উভয় পথেই ব্যবসায়-বাণিজ্য করে আসছিল, তাদের উটের বহর পার্শ্ববর্তী সকল দেশে চলাচল করত।

আরব দেশ সমুদ্রপথে অন্যান্য বড় বড় দেশের সংগে যুক্ত। আরব ও ভারতের মধ্যে রয়েছে ভারত মহাসাগর; একটি নদী দ্বারা ইরানের একটি অংশের সংগেও আরব যুক্ত; যে আবিসিনিয়া এক সময়ে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশাল কেন্দ্র ছিল তাও সমুদ্রপথে আরবের সঙ্গে যুক্ত। চীনা দ্রব্যসম্ভার চীন সাগর ও ভারত মহাসাগর পার হয়ে এসে পেঁাছত আরব দেশে। সিরিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগরে পেঁাছে তারা রোমীয় ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে এসেছিল। বাহরাইন, ইয়ামামা, ওমান, হাদ্রামাউত, ইয়ামান ইত্যাদি উর্বর ও শস্য-শ্যামল এলাকাসমূহ সবই সমুদ্র উপকূলবর্তী। এসব ভূ-প্রকৃতিগত কারণেই আরবরা সমুদ্রগামী জাতিতে পরিণত হয়।

অজ্ঞানতার যুগে

এখন একটি প্রশ্ন ওঠেঃ আরবরা কি ইসলামের আবির্ভাবের পরে সমুদ্রপ্রিয় জাতিতে পরিণত হয়, নাকি ইসলাম-পূর্ববর্তী আমল থেকেই তারা সমুদ্রপ্রিয় ছিল? প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অজ্ঞানতার যুগেও আরবরা

---

১. সফর তাকাবিন, পৃঃ ২৫—৩৭।

নৌযাত্রার সঙ্গে পরিচিত ছিল; কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পরে তাদের ধর্মীয় ও আত্মিক জীবনেই কেবল যাদু-মন্ত্রের ছোঁয়া লাগেনি; সামুদ্রিক জীবনেও বিরাট ক্রিয়াকান্ডের ঢেউ লাগে এবং তারা দুনিয়ার সকল অংশে দুঃসাহসিক সমুদ্র যাত্রা করতে থাকে। প্রাচীন আরব অভিধান, প্রাক-ইসলামী কবিতা ও মূর্তি পূজারী আরবদের ধর্মপুস্তক থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ইসলামী সভ্যতার বিকাশের আগে থেকেই আরবরা নাবিক হিসাবে সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল।

যে-কোন জাতির রুচি ও রীতি-নীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাদের ভাষায়। দেশের অধিবাসীদের নিকট অপরিচিত কোন ধারণা বা কার্যকলাপ কিছুতেই উপরিউক্ত তিনটি তথ্য-সূত্রের কোনটিতে স্থান পেতে পারে না। উপরে উল্লেখের ক্রম অনুসারে প্রথমই আমরা দেখব যে, সবচেয়ে প্রাচীন আরব অভিধানে নৌ-চালনা, সমুদ্র যাত্রা, জাহাজ, ইত্যাদি বিষয়ক অসংখ্য শব্দ রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু শব্দ বিদেশী—যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের নৌ-যোগাযোগ ছিল। সমুদ্র শব্দের আরবী بحر (বহর) দ্বারা সমুদ্র ও নদী দুই-ই বুঝায়, يم (ইয়াম) শব্দ দ্বারাও এই উভয়কে বুঝায়। কুরআন শরীফে শব্দটি দ্বারা নীল নদী ও লোহিত সাগর উভয়কেই বুঝানো হয়েছে (সূরা তা'হা ঃ ২)। قاموس শব্দ দ্বারা মহাসাগর বুঝায়। খ্যাতনামা অভিধানিক মাজদ-উদ-দীন ফিরোজাবাদী (ওফাত ৮১৭ হি.) তাঁর অভিধানের নাম দিয়েছেন 'আল-কামুস আল-মুহিত।' শব্দটি قمس (কুমস) জাত যার অর্থ হচ্ছে "ঝাঁপ দিয়ে পড়া", কামুস অর্থ 'গভীর কূপ যাতে বালতি ডুবানো যায়।' শব্দটির ভিন্নরূপ قيمس বা قومس (কামিস বা কাউমাস) দ্বারা 'সাগর' বুঝায় এর বহুবচন হচ্ছে 'কামায়িস'। আরেকটি শব্দ قلمس (কালামুস) দ্বারা কূপ বা নদী বুঝায় যাতে প্রচুর পানি রয়েছে। خضم (খাযাম) অর্থ 'নদী' কিন্তু خضرم (খাযরাম) দ্বারা 'সাগর' বুঝায়। অনুরূপ আরো উদাহরণ পাওয়া যায়।

নৌকা ও জাহাজ

প্রাচীন আরবীতে فلك و سفينة (সফিনা ও ফুলক) শব্দ দুইটি দ্বারা সাধারণভাবে নৌকা ও জাহাজ বুঝানো হত। প্রাচীন আরবী কবিগণ প্রধানত 'সফিনা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং কুরআন শরীফে 'ফুলক' শব্দটি প্রায়শ ব্যবহৃত হয়েছে। দু'টি শব্দই খাঁটি আরবী। 'সাফান' অর্থ গোঁজের সাহায্যে কাঠ ফাঁড়া, কাজেই 'সফিন' বা 'সফিনা' শব্দের অর্থ হয় 'ফাঁড়া কাঠ'; 'ফালাক' অর্থ 'সমুদ্রের ঢেউ', সম্ভবত 'ফুলক' শব্দের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে; 'ফুলুক' অর্থ 'জাহাজ'।

প্রাচীন আরবী কবিগণের মধ্যে তরফাহ্ এবং আস্‌হা নৌকা অর্থে بوصى (বুসি) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আরব অভিধানিকগণের মতে এই শব্দটি ফার্সী بوزى শব্দের আরবী রূপ। এই দু'জন কবিই বড় নৌকা বা জাহাজ বুঝাতে خلية (খালিয়াত) শব্দ ব্যবহার করেছেন আর কুরআন শরীফে বড় নৌকা বা জাহাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে جارية (জারিয়া) এবং বহুবচনে جوارى (জাওয়ারী) (সূরা আল-হাক্কা, সূরা শূরা : ৪ এবং সূরা আর-রাহ্‌মান)।

বিপদ-আপদের সময়ে ব্যবহারের জন্যে বা অতিরিক্ত মাল-সামান বহনের জন্যে বড় জাহাজের সংগে যে ছোট নৌকা থাকত সেগুলোকে বলা হত قارب (কারিব)। এর বহুবচন 'কাওয়ারিব ও আকরাব' (লিসানুল-আরব অনুসারে)।

আব্বাসীয় আমলে নৌকার জন্যে অনেক নতুন নতুন শব্দের প্রচলন হয়। আবু আলী মোহসীন তানুখী (ওফাত ৩৮৪ হি.) দজলা নদীতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ভ্রমণের জন্যে ব্যবহৃত নৌকাকে বলেছেন طيار (তাইয়ার) এবং প্রমোদ ভ্রমণের জন্যে ব্যবহৃত ছোট নৌকাকে বলেছেন زورق (জাওরাক)। খাফফাজীর (১১শ শতক) মতে আরেকটি শব্দ 'সানবাক বা সানবুক' দ্বারা হিজাজের লোকেরা ছোট নৌকা বুঝাত; معدى (মি'দী) শব্দ দ্বারা ছোট নৌকা বুঝাত।

নৌচালনা ও নাবিক

নৌযাত্রাকে সাধারণভাবে আরবরা বলত ملاحة (মিলাহ্)। শব্দটি ملح (মিলহ্) জাত যার অর্থ লোনা। লোনা পানি থেকে যারা নুন তৈরী করত তাদেরকে বলা হত ملاح (মাল্লাহ্)। পরবর্তীকালে যে কেউ সমুদ্রযাত্রা করত তাকে 'মাল্লাহ্' বলা হত আর নৌ-চালনাকে বলা হ'ত মিলাহাত। আবার 'সিফানাত'ও বলা হত। বলাই বাহুল্য, যে শব্দটি 'সফিনা' থেকে উদ্ভূত। কাজেই দেখা যায় যে, নাবিককে আরবীতে বলা হত 'মাল্লাহ' ও 'সাফফান'। বহর শব্দজাত 'বাহার' কথাটি দিয়েও তারা নাবিক বুঝাত।

পারস্য উপসাগরের আরব নাবিকগণের মধ্যে আরেকটি শব্দ প্রচলিত ছিল, 'না'খুদ,' এর বহুবচন ছিল 'নাওয়াখিদ'। এটি একটি হিন্দী-ফার্সী মিশ্রিত শব্দ—হিন্দী 'নাও' এবং ফার্সী খুদা, অর্থ জাহাজের প্রধান, অর্থাৎ কাপ্তান। ভূমধ্যসাগরের নাবিকদের বলা হত 'নুতী' এবং 'নওয়াত'। এই শব্দটি প্রাক-ইসলামী যুগে এবং খিলাফতের যুগে প্রচলিত ছিল।

'লিসানুল আরবে' বলা হয়েছে যে, 'নুতী' ও 'মাল্লাহ' ছিল তারাই যারা জাহাজ পরিচালনা করত। এর আরবী রূপ হয় 'নওয়াত'। ইবনে আব্বাস (রাঃ) কুরআন শরীফের একটি সূরা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "তারা ছিল নওয়াত—নাবিক" (লিসানুল-আরব)।

জওহরীর মতে শব্দটি সিরীয়দের কাছ থেকে গৃহীত, যার অর্থ শব্দটির মূল নিশ্চিতভাবে গ্রীসীয় ল্যাটিন। ফরাসী শব্দ 'নটিক', ইংরেজী শব্দ 'নেভী', 'নেভিগেশন', 'নেভাল' ও 'নটিক্যাল' এই সবেরই মূল শব্দ হচ্ছে ল্যাটিন 'নটিয়ানুস'। কিন্তু আরো গবেষণা করলে দেখা যাবে যে, এ শব্দগুলোর আদি উৎস হচ্ছে হিন্দী 'নাও'। দক্ষিণ ভারতে 'নাইয়াত' বা 'নাওয়াইয়াত' নামে আরব রক্তের কিছু লোক বাস করত। খুব সম্ভবত এই নওয়াতিনরা আরব নাবিকদের বংশধর, ক্রমে তারা ভারতের উপকূলবর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করে।

'খাল্লাসী' শব্দটি দিয়ে সাধারণ জাহাজের চাকর বা সাধারণ কর্মচারী বুঝায়। এ শব্দটিরও মূল আরবী। আরবীতে 'খালাস' অর্থ সাদা-কালোর মিশ্রণ আর সাদা ও কালো পিতামাতার সন্তানকে বলা হত 'খাল্লাসী' (লিসানুল আরব)। আরবরা সাধারণত হাবশী মেয়েদেরকে ঘরের কাজে নিযুক্ত করত। এসব ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তানদের অধিকাংশকেই জাহাজে কাজ করতে দেওয়া হত। এই কর্মচারীদেরকে বলা হত 'খালাসী'।

জাহাজের পালের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীকে বলা হয় 'দারী' (داری)। এটি প্রাচীন আরবী শব্দ, হযরত আলী (রাঃ) এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নৌচালক বা জাহাজ চালকের আরেকটি আরবী নাম হল 'সারী'। আশা মায়মুনের একটি কাসিদায় 'সারী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের আরবীতে দেখা যায় যে, জাহাজের কাপ্তানকে সচরাচর 'রব্বান' বলা হত। শব্দটি সম্ভবত 'রব' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ মালিক বা প্রভু। প্রাচীন আরবীতে এর অর্থ ছিল সব বা সমগ্র, কিন্তু এমনও হতে পারে যে, শব্দটি ফারসী 'রাহবান'-এর আরবীকৃত রূপ, যা দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বুঝাত যিনি জাহাজ সঠিক পথে চলছে কিনা তা দেখতেন। অনুরূপ আরেকটি ফার্সী শব্দ 'দিদবান' (دیدبان) আরব নাবিকেরা প্রায়ই ব্যবহার করত। জাহাজের মূল মাস্তুলের সঙ্গে উপরে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণ স্থান থেকে যে কর্মচারী সামনের আগুয়ান বিপদ-আপদ—যথা, ভাসমান শিলা, অন্য কোন জাহাজ বা তুফান লক্ষ্য করত (অর্থাৎ পর্যবেক্ষক) তাকে বলা হত 'দিদবান'।

আব্বাসীয় আমলে জাহাজের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ কর্মচারিগণকে বলা হত 'মাল্লাহ্' ও 'খাল্লাসী' আর উচ্চপদস্থ নাবিকগণকে বলা হত 'রাউসা'। এর একবচনে রূপ হল 'রইস' পরবর্তীকালে জাহাজের কাপ্তানকে যে 'রীস' বলা হত তা এরই বিকৃত রূপ। ৯ম ও ১০ম শতকে জাহাজের কাপ্তানকে বলা হত 'মুয়াল্লিম' (معلم)। শেষোক্তটি কম ব্যবহৃত হলেও দু'টি শব্দ দ্বারা একই অর্থ অর্থাৎ কাপ্তান, বুঝাত। এর আরও কয়েকটি রূপ 'ছিল, যথা, 'রায' (راز) 'রাইয' (رائيز) ও 'রীজ' (ريز), সবই রোজ' (روز) শব্দজাত, যার অর্থ হচ্ছে 'অভিজ্ঞ' বা 'পারদর্শী।'[১]

বন্দর ও উপকূলের নাম

বন্দরের সবচেয়ে প্রাচীন আরবী শব্দ হচ্ছে, 'মারফা' (مرفا)। শব্দটি 'রাফা' (رفا) জাত যার অর্থ হচ্ছে (জাহাজকে) কিনারায় আনা। পরবর্তীকালে একই অর্থে 'মীনা' (ميناء) ও তার বহুবচন 'মুআনী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একই অর্থে ব্যবহৃত 'ইসকালা' শব্দটির মূলে ল্যাটিন। 'বন্দর' শব্দটি ফার্সী। 'খোর' ও 'খালিজ' শব্দ দু'টি দ্বারা উপসাগর বুঝায়। 'জেদ' (جد) একটি প্রাচীন শব্দ যার অর্থ সাগরের কিনারা; আরবের বিখ্যাত উপকূলবর্তী শহর 'জেদ্দা' নাম এই 'জেদ' শব্দজাত। পরবর্তীকালে উপকূল অর্থে 'শাত' (شط) ও 'শাতী' (شاطئ) শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। 'সাহিল' (ساحل) শব্দটি এই অর্থ বোঝাতে বেশী মশহুর। 'দুফফা' (ضفة), 'সিফ' (سيف), 'আবর' (عبر) ও হায়িষা (حيزه) শব্দগুলো দ্বারাও একই অর্থ বুঝায়। 'ইরাক' (عراق) অর্থ সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত প্রান্তর।

নৌ-চালনায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ

নীচে আমরা নৌ-চালনার সঙ্গে সম্পর্কিত কতগুলো আরবী শব্দের তালিকা দিলাম। এ থেকে ধারণা করা যাবে যে, নৌ-চালনার ক্ষেত্রে আরবরা কতদূর অগ্রগতি সাধন করেছিল।

'ইকলা' (اقلاع), পাল টানানো; 'ইশরা' (شراع) জাহাজ ছাড়া, 'ইনশা' (انشا) পাল খোলা, 'ইরফা' (ارفا) জাহাজ কিনারায় নেওয়া, 'ইরসা' (ارسا) নোঙর করা, 'জাযাফ'-'জাদাফ' (جدف — جزف) এক দাঁড় দিয়ে নৌকা চালানো; 'মাকযাফ,' 'মারদী' মাজযাফ,'' মাজদাফ' (مقذف — مجذف — مجدف — مردى) দাঁড়; 'সুক্কান' ও 'কওতল' (سكان

১০ ''লিসানুল-আরব'' এবং ''শাফা উল-গালিল''।

كوثل) ছোট নৌকা; 'কিলা' 'শ্রা' 'জ্বল' (قلع - شراع - جل) পাল তাইক (طايق) নৌকা বা জাহাজের দুই তক্তার মাঝের ফাঁক; 'দাকল' ও 'সারী' (صارى - دقل) পাল খাটানোর মাস্তুল বা মাস্তুল সংলগ্ন কাঠ; কালাস (قلاس)জাহাজে কোন ফাটল বা ছিদ্র 'জু জু' (جو جو) জাহাজের সামনা; 'দিশার' (دسار) যে রশি ও লোহার পেরেক দ্বারা জাহাজের দু'টি তক্তা জোড়া দেওয়া হয়; 'মিসমার' (مسمار) পেরেক বা তারকাঁটা; 'সুমার' (سمر) জাহাজের তক্তা জোড়া দেওয়া; 'খাযার' (خرز) সেলাই পদ্ধতিতে জাহাজের তক্তা জোড়া দেওয়া; 'কালাফ' (قلف) তক্তা জোড়া দেওয়া এবং আলকাতরা দিয়ে ফাঁক বন্ধ করা; 'লাউহ্' (لوح) জাহাজের বিভিন্ন তলা; 'মিল্লাহ্' (ملاح) সুবিধাজনক হাওয়া; 'শাহান' (شحن) জাহাজে মালপত্র বোঝাই করা; 'যিয়ার' (زيار) দড়ি বা রশি; 'মাখার' (مخر) জাহাজ চলাকালে পানির সমতার মাপ পার হওয়া; 'সাবুর' 'সবর' (صابور - صبور) জাহাজ স্থির রাখার জন্যে ব্যবহৃত ভারী বস্তুসমূহ।

নতুন শব্দ

ইসলামের অভ্যুদয়ের পরে আরবরা যখন নৌ-চালনায় অগ্রগতি সাধন করে তখন অনেক নতুন শব্দ গৃহীত হয়। যথা ঃ 'খাতিফ' (خطف), নোঙর তুলে রওনা হওয়া; (اقلاع) 'ইকলা' শব্দটি দিয়ে প্রথমে 'পাল তোলা' বুঝাত, পরে তা 'জাহাজ চালানো' অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে; 'য়াযাব' (عذب) অর্থ মিঠা পানি, তাই 'ইসতিযাব' (استعذاب) অর্থ হয় জাহাজের জন্যে মিঠা পানি জোগাড় করা। 'বার' (بار) আরেকটি নতুন শব্দ, অর্থ উপকূল বা কিনারা। শব্দটি সম্ভবত ফার্সী বা সংস্কৃত থেকে ধার করা। দক্ষিণ ভারতের মালাবার ও কোলাবার এবং আফ্রিকার জাঞ্জিবার-এর সবখানে 'বার' কথাটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবত শব্দটি সংস্কৃত 'বার' (بار) শব্দের (যথা কাতিয়াবার, কারবার) আরবীকৃত রূপ।

শব্দের বিভিন্নতা

ভারত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের নাবিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে তফাত ছিল। মাস্তুলকে ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগরে বলা হত 'দাকল' (دقل) কিন্তু ভূমধ্যসাগরে বলা হত 'সারী' (صارى)। কোন কোন শব্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ 'তা'বীহ' (تعبية) দ্বারা প্রাচীন আরবীতে বুঝাত 'খাদ্য দ্রব্য জোগাড় করা', পরে শব্দটি দ্বারা বুঝাত 'সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করা' এবং আরো পরে

বুঝাত 'জাহাজে সরবরাহ করা'। প্রাচীন আরবীতে 'নজল' (نجل) দ্বারা বুঝাত 'নিয়োগ করা' পরবর্তীকালে বুঝাত 'জাহাজ থেকে মাল খালাস করা'। 'রিকাব' ব্যবহৃত হত জাহাজের যাত্রী অর্থে। তেমন 'মারকাব' (مراكب) দ্বারা কেবলমাত্র জাহাজ বুঝাত। 'খুব' (خب) শব্দের আদি অর্থ ছিল 'ঘোড়ার দৌড়' কিন্তু পরবর্তীকালে শব্দটির অর্থ হয় 'ঘূর্ণিঝড়'। হিজরী তৃতীয় শতকের জনৈক নাবিক আবুল হাসান সিরাফী শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখেন : 'খুব' অর্থ 'সমুদ্রে আলোড়ন সৃষ্টি হাওয়া'।

বিদেশী শব্দ গ্রহণ

অনেক বিদেশী শব্দও আরবীতে গ্রহণ করা হয়। যথা, ফার্সী, হিন্দী, চীনা, গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি। নীচে আমরা-এর কিছু উদাহরণ দিলাম :

ফার্সী শব্দ

শব্দ	অর্থ	মূল শব্দ
رهنانج - رهماني	জাহাজ চলাচলের পথের মানচিত্র	রাহনামা
سنبوك - سنبوق - صنبك	ছোট নৌকা	সানবুযা
قرواز	নৌকা বা জাহাজের কিনারা	পারওয়ায
انجر - لنجر	নোঙর	লঙর

হিন্দী শব্দ

دوانيج	ছোট নৌকা	ডোঙ্গি
بارجه - بيرجه	নৌবহর	বেরা
هوري	ছোট নৌকা	হুরি
بلنج	জাহাজের কক্ষ (কেবিন)	পালংক
باناني	ভারতীয় বণিক, পরবর্তীকালে অর্থ বদল হয়ে জাহাজের যাত্রী	বানিয়া

ইবনে বতুতা একটি চীনা শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'জাঙক' جنك যার অর্থ 'বড় জাহাজ'। অনুরূপ অসংখ্য গ্রীসীয় ও ল্যাটিন শব্দ রয়েছে। এগুলো রোমীয়দের কাছ থেকে আরবরা গ্রহণ করে।

যুদ্ধ জাহাজ

আরবরা রোমকদের পদ্ধতিতে তাদের জাহাজ সুসজ্জিত করত এবং রণতরীর বিভিন্ন জিনিস বুঝানোর জন্যে তারা অনেক রোমীয় শব্দও গ্রহণ

করেছিল, যথা: اسطول। বহুবচনে اساطول। (অর্থ নৌবহর)। শব্দটি গ্রীক। মাকরিযী এবং ইবন খালদুন শব্দটি প্রচুর ব্যবহার করেছেন। আরেকটি শব্দ شلندي উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলীতে ব্যবহৃত হত, এ ছিল এক ধরনের যুদ্ধ জাহাজের নাম। এটা গ্রীসীয় শব্দ 'সালানদিয়ান' বা 'চালানদিয়ান' থেকে ধার করা। ভূমধ্যসাগরে এক ধরনের বড় যুদ্ধ জাহাজকে বলা হত شيني বহুবচনে اشوان একশ' চল্লিশটি দাঁড়ে এই জাহাজ চলত। (ইবন খালদুন)

আরেকটি যুদ্ধ জাহাজের নাম ছিল اغراب—। এটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কাক। ফরাসী ও ল্যাটিন ভাষায় কাককে বলা হয় যথাক্রমে 'করভেট' ও 'করভাস'। দু'টি শব্দেরই মূল এক বলে মনে হয়। হিজরী ১১শ' শতকের লেখক খাফফাজী 'শাফা উল-গালিল' বইতে লেখেন যে, শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হত কিনা জানা যায় না। গুজরাটের আসফী মক্কী তাঁর 'জাফরুল-ওয়ালাহ' (১ম খন্ড, পৃ. ৩৬-৪১, লন্ডন সংস্করণ) নামক আরবীতে লিখিত গুজরাটের ইতিহাস গ্রন্থে জাহাজ অর্থে 'برشة' শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ জাহাজের জন্যে অনেক নতুন নতুন শব্দ আরবীতে প্রচলিত হয়। যথা: طريدة - مسطحات - حراقة - عرادة — بطسة বহুবচনে بطس অর্থও জাহাজ। সুলতান সালাহউদ্দীনের রাজত্বকালে ইস্পাহানের আম্মাদ কাতির তাঁর 'আল-ফাতাহ আল-কাসি' বইতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ কারখানাকে আরবীতে বলা হত 'دار الصناعة' ফরাসী 'দারসীন' ও ইংরেজী 'আরসেনাল' শব্দ দু'টি এই মূল আরবী শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় আরবী শব্দ

নীচে উল্লেখিত আরবী ও ফারসী শব্দসমূহ এখনো বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়, যথা, 'আমীর আল-বহর' (امير البحر) 'আমিরালহ' (পর্তুগালীয়) 'আমিরাল' (ফরাসী) ও 'অ্যাডমিরাল' (ইংরেজী)। الرئيس (আরায়েষ), غراب (করভেট) فلك (ফ্রুগা), قلفط (কালপ্যাট), لنكر (অ্যাংকর) الحراقة (অ্যালহারগো), حبل - كبل (ক্যাবল)।

এই শব্দগুলো নিজেরাই তাদের ইতিহাস ব্যক্ত করে। শব্দগুলো থেকে আমরা কেবল যে আরব নৌ-চলাচল এবং নৌ-যুদ্ধের ইতিহাস জানতে পাই তাই নয়; আরবদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যোগাযোগ এবং সম্পর্কের কথাও জানতে পারি।

প্রাচীন আরবী কবিতা : ইতিহাসের সঙ্গী

প্রাক-ইসলামী যুগের আরব ইতিহাসের একমাত্র উৎস হল আরবী কবিতা। এতে প্রায়ই নদী, সাগর ও নাবিকগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। খুবই স্বাভাবিক যে, নদী বা সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারী কবিগণই ছিলেন সে সব কবিতার রচয়িতা। যে সকল কবি প্রায়ই বাহরাইন বা পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় যেতেন এবং যাঁরা দজলা ও ফোরাত এলাকায় বসবাস-কারী 'মানযিরা' (মুনাযির থেকে আগত) নামে পরিচিত ইরাকের শাসক-গণের—যাঁদের রাজধানী ছিল হিরাতে—দরবারেও হাযির হতেন, তাঁদের কবিতাতেই সেসব শব্দ বেশী দেখা যায়। ইসলামের অভ্যুদয়ের বিশ-পঁচিশ বছর আগে আবির্ভূত তরুণ কবি তারফা বাহরাইন ও হীরাতে যাতায়াত করতেন। তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা 'সাব'য়া মুয়া'ল্লাকা'তে (সাতটি ঝুলন্ত গাঁথা) তিনি তাঁর দ্রুতগামী উটের—মহ্মলের ডান-বাম দুলুনীকে তুলনা করেছেন বড় দোদুলামান জাহাজের সঙ্গে, আর লম্বা বাঁকা ঘাড়কে তুলনা করেছেন নৌকার পাছার সঙ্গে। তিনি লিখেছেন :

> মালিক গোত্রের নারীগণের বাহনগুলোকে ভোরবেলা যাত্রার সময়ে মনে হচ্ছিল যেন নওয়াসিফের বিশাল জাহাজ, যেন রোমীয়দের জাহাজ, যেন ইবনে ইয়ামানের জাহাজ; নাবিকেরা কখনো সেগুলোকে নিয়ে যায় পথ থেকে বেপথে, কখনো আবার ঠিক পথে।

গভীর সমুদ্রে নাবিকেরা কেমন করে জাহাজ চালাত এবং কখনো তারা যে পথভ্রষ্ট হয়ে বিপথে চলে যেত তার একটি সুন্দর বর্ণনা রয়েছে এই ছত্রগুলোতে। শেষ ছত্রে একজন আরব নাবিক ইবন ইয়ামানের উল্লেখ রয়েছে, তাঁর অনেক জাহাজ ছিল। কথিত আছে যে, ইনি বাহরাইনের শাসক ছিলেন এবং বড় জাহাজ নির্মাণ করতেন। ইমরুল কায়েসও একটি কবিতায় ইবন ইয়ামানের নাম উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন যে, বাহরাইনের কাস্‌র-ই-মুশকারের নিকটে তাঁর অনেক বাগিচা ছিল। ইবন ইয়ামান জাহাজ নির্মাতা বা নাবিক যাই হয়ে থাকুন না কেন, তিনি অজ্ঞান-তার যুগে জীবিত ছিলেন। ইয়ামান নামটি হিব্রু 'ইয়ামিন' শব্দের আরবীকৃত রূপ, এ থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি সম্ভবত ছিলেন একজন ইয়াহুদী সওদাগর এবং তাঁর অনেক জাহাজ ছিল।

জাহাজের গায়ে কিভাবে ঢেউ ভেঙে পড়ে তার একটি বাস্তব চিত্র এঁকেছেন তারফা তাঁর কবিতায় :

> জাহাজ বুকে সাগরের ঢেউ ভেঙ্গে চলে, যেন ছোট্ট শিশু খেলাচ্ছলে হাত দিয়ে এক স্তূপ কাদা কেটে দুই ফাঁক করে।

একটি কবিতায় তিনি তাঁর উটনীর দীর্ঘ গ্রীবার প্রশস্তি গেয়েছেন:

সে যখন দীর্ঘ বাঁকা ঘাড় তুলে উঠে দাঁড়ায় তখন মনে হয় যেন একটি জাহাজের হাল, পাল তুলে দজলা দরিয়া দিয়ে উজানে যাচ্ছে।

এই কবিতাটি থেকে বুঝা যায় যে, সে আমলে দজলা নদী দিয়ে জাহাজ চলত। তারফা দু'টি কবিতায় জাহাজের জন্যে দু'টি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন—এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। প্রথম কবিতাটিতে তিনি জাহাজ বুঝতে 'আদুলিয়া' (عدولية) ব্যবহার করেছেন। এটি গ্রীক শব্দ এবং হতে পারে যে, রোমীয়রা ভূমধ্যসাগরে শব্দটি ব্যবহার করত। দ্বিতীয় কবিতাতে জাহাজকে তিনি বলেছেন 'বুসী'(بوصي)। এই শব্দটির মূল ফার্সী সম্ভবত দজলা ও পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় শব্দটির ব্যবহার হত। একজন কবি তাঁর একটি গাঁথাকাব্যে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সাগরে ব্যবহৃত এবং দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাজাত শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করেছেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, পারস্য উপসাগর ও ভূমধ্যসাগরে নৌ-চালনরত পারসিক ও রোমীয়গণের সঙ্গে আরবদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

অন্ধকার যুগের সুবিখ্যাত কবি আ'শা মায়মুনও হীরার দরবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর কাব্যে সমুদ্রের বুকে তুফানের বিশালত্বের মহিমা এবং ফোরাত নদীতে চলমান নৌকার সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। সাগরের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাত্র একটি উদাহরণ দেব:

ফোরাত নদীর মত এর তরঙ্গ যখন উঠে তখন জাহাজ নিক্ষিপ্ত হয় সাঁতারু ছিটকে পড়ে।

কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার কবিতা লিখেছেন, রাবিয়ার (ইরাক) তাগলাব গোত্রের সুবিখ্যাত বীররসের কবি আমর ইবন কুলসুম। উৎসাহব্যঞ্জক গৌরবময় ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন:

সেনাদল নিয়ে যমীন দিয়ে যখন দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেছি তখন আমাদের পদভারে রণক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে গেছে, সাগরের ঢেউ ছেয়ে গেছে আমাদের নৌকা আর নৌকায়।

এ থেকে বুঝা যায় যে, আরবরা শুধুমাত্র নির্ভীক নাবিকই ছিল না, তারা নৌযুদ্ধেও অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী ছিল।

অপর একজন আরব কবি সাগরে চলমান নৌকার বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপভাবে:

পাল তোলা জাহাজগুলো যখন একবার ঢেউয়ের ঘাড়ে চড়ে এবং আবার নীচে নেমে আসে তখন তারা যেন সাগরের আসমানকে ফেঁড়ে ফেলে।

কুরআন শরীফ

অজ্ঞানতার যুগের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হল কুরআন শরীফ। কুরআন সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় আজ পর্যন্ত রক্ষিত আছে। কুরআনের আয়াতে সাগর ও জাহাজের বহু উল্লেখ রয়েছে। ২৮টি সূরাতে জাহাজের উল্লেখ রয়েছে, ২৩টি সূরাতে فلك শব্দটি রয়েছে, দু'টি সূরাতে جوار কথাটি, একটি সূরাতে سفينة শব্দটি এবং আর একটি সূরাতে আছে ذات الواح و دسر যার অর্থ 'তক্তা ও পেরেকের তৈরী' এবং আর একটি সূরাতে পাই جارية শব্দটি।

কুরআন শরীফে নৌকা বা কিশতীর সর্বপ্রাচীনকালীন উল্লেখ পাওয়া যায় হযরত নূহ্ (আঃ)-এর আমলের বন্যার সময়কার। তাঁর প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ এসেছিল :

এবং আমাদের চোখের সামনে কিশতি তৈরী কর।—সূরা হূদ : আয়াত-৩৭

কি কি দিয়ে কিশ্‌তি নির্মাণ করা হয়েছিল তা পাওয়া যায় একটি সূরাতে :

তক্তা ও পেরেক দ্বারা নির্মিত সেটিতে আমরা তাঁকে আরোহণ করালাম।

—সূরা কামার : আয়াত-১২

এ থেকে বুঝা যায় যে, তক্তা ছিদ্র করে তাতে পেরেক মেরে নৌকা, জাহাজ বা কিশতী তৈরী করা হয়েছিল এবং তা মজবুত হয়েছিল যে সেটা পাথরের মত সুদৃঢ় থেকে ঢেউ-এর আঘাত প্রতিহত করেছিল :

'এবং তাদেরকে নিয়ে পর্বত সদৃশ উঁচু উঁচু ঢেউ-এর মধ্য দিয়ে চলতে লাগল।' —সূরা হূদ : আয়াত-৪২

এসব জাহাজ ছিল একেকটা পাহাড়ের সমান বড় আর উঁচু, প্রবল হাওয়া কাটিয়ে দুর্জয় হয়ে এগিয়ে যেত সামনে আর আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশ করত :

এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে উঁচু উঁচু জাহাজ, যেগুলো বিশাল পর্বতের মত সমুদ্রে চলাচল করে। তিনি ইচ্ছা করলে হাওয়া শান্ত হয়ে। যায় যার ফলে (চলমান জাহাজ) সাগরের বুকে নিশ্চল হয়ে যায়। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে, ধৈর্যবান ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে। —সূরা শূরা : আয়াত—৩২-৩৩

আরেকটি আয়াত থেকে জানা যায় যে, এসব জাহাজের পাল ছিল সব পর্বত সমান উঁচু :

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ -

তাঁর জাহাজসমূহ পর্বত সমান উঁচু পাল তুলে সাগর দিয়ে চলতে থাকে। —সূরা আর-রহমান : আয়াত-২৪

মানুষকে আল্লাহ্ যে কত অশেষ রহমত দান করেছেন কুরআন শরীফে তার অনেক উল্লেখ রয়েছে। বিশেষভাবে, আরবদের নৌকার কথা বলা হয়েছে—যাতে করে মানুষ সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতেও পারে ও মালপত্র আনা-নেওয়া করতে পারে ঃ

اللّٰه الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره
ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون —

আল্লাহ্ই সাগরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর হুকুমে সেখান দিয়ে জাহাজসমূহ চলাচল করতে পারে। তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে লাভবান হতে পার, তাঁর দেওয়া প্রাচুর্য ভোগ করতে পার এবং তাঁর শোকর গুযার করতে পার।

—সূরা আল-জাছিয়াহ ঃ আয়াত-১২

الم تر ان اللّٰه سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی
البحر بامره -

তোমরা কি দেখতে পাও না যে, আল্লাহ্ দুনিয়ার সব কিছু তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, আর জাহাজসমূহ তাঁর হুকুমে সাগর দিয়ে চলাচল করে? —সূরা হজ্জ ঃ আয়াত-৬৫

সওদাগর আরবরা, বিশেষ করে কুরাইশরা ব্যবসার জন্যে যে যাতায়াত করত সে রকম ছোট নৌ-পথের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো সম্ভবত পারস্য উপসাগর, দজলা নদী, ফোরাত নদী, নীল নদী, ওকাবা উপসাগর ও মৃত সাগর।

যে প্রয়োজনে জাহাজ সাগর দিয়ে যাতায়াত করত আর আরবরা কি কি ধরনের কাজ করত তা নীচের আয়াতটি থেকে জানা যায় ঃ

তিনি সাগরকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা সেখান থেকে মাছ খেতে পার, পরিধানের জন্যে অলংকার আহরণ করতে পার এবং দেখ যে ঢেউসমূহ ভেঙে জাহাজ পথ করে চলেছে যা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে তোমরা আল্লাহ্র অশেষ রহমত লাভ করে ধনী হতে পার এবং তাঁর শোকর আদায় করতে পার। —সূরা নাহল ঃ আয়াত-১৪

আরেক জায়গায় দু'টি নদীর উল্লেখ রয়েছে, তার একটির পানি মিঠা এবং অপরটির পানি লোনা; কিন্তু দু'টিতেই মাছ রয়েছে, একটির নীচে মুক্তা ও প্রবাল রয়েছে, এটিতে জাহাজ চলাচল করে। এখানে যে দু'টি নদীর কথা বলা হয়েছে তাদের একটি হচ্ছে ফোরাত নদী, যার পানি মিঠা এবং আরেকটি হচ্ছে পারস্য উপসাগর, যার পানি লোনা :

এবং দু'টি সাগর এক প্রকার নয়, একটি পরিষ্কার ও মিষ্টি পানি সুপেয় কিন্তু অপরটি লোনা ও পানি পানের অনুপযোগী, তাদের উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশ্‌ত (মাছ) খাও এবং পরিধানের অলংকার আহরণ কর এবং তোমরা দেখতে পাও যে, এগুলোর মধ্যে জাহাজ চলাচল করে যার দ্বারা তোমরা আল্লাহ্‌র অশেষ দান লাভ করতে পার এবং তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। —সূরা ফাতির : আয়াত-১২

এই দুই নদীকেই সূরা আর-রহমানে বর্ণনা করা হয়েছে :

তিনিই দু'টি সাগরকে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত করেছেন যাতে সে দু'টি একত্রে মিলিত হয় : তাদের মাঝখানে একটি বাধা আছে যা তারা অতিক্রম করতে পারে না, তাহলে তোমার রবের কোন রহমত তুমি প্রত্যাখ্যান করবে ? তাদের উভয়টি থেকেই মুক্তা ও প্রবাল আহরিত হয়ে থাকে। তাহলে তোমার রবের কোন রহমত তুমি প্রত্যাখ্যান করবে ? সমুদ্রের মাঝে পর্বতের মত পাল উঁচু করা জাহাজসমূহকে তিনিই চালিত করেন। —সূরা আর-রহমান : আয়াত—১৯-২৩

সুবাতাস পেলে তবেই জাহাজ এগিয়ে যেত :

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, তিনি হাওয়া প্রবাহিত করেন যা বৃষ্টির সুসংবাদ বয়ে আনে যা থেকে তোমরা তাঁর রহমতের স্বাদ গ্রহণ করতে পার। এবং তাঁর হুকুমে পাল তুলে জাহাজ চলাচল করে যদ্দ্বারা তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাঁর অশেষ রহমত দ্বারা ধনী হতে পার এবং তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পার।

—সূরা রুম : আয়াত-৪৬

উপরের সূরাসমূহ থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, আরবরা নৌ-চালনা করত (১) মাছ ধরতে, (২) মুক্তা ও প্রবাল আহরণ করতে, এবং (৩) ব্যবসায়ের লাভের উদ্দেশ্যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে দ্রব্যসম্ভার পাঠাতে।

অন্তহীন সাগরে দুরন্ত হাওয়ার সামনে দুর্বল প্রাণী মানুষ ছিল একেবারেই অসহায়। তাদের মুখে পড়ত মৃত্যুর ছায়া। সেই চরম নিরাশায় তাদের একমাত্র ভরসা থাকত বাঁচানোর মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ :

এবং তাদের জন্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে যে, আমরা দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ জাহাজে তাদের পিতৃপুরুষগণকে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং তাদের আরোহণের জন্যে আমরা অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি আর আমরা ইচ্ছা করলে তাদের ডুবিয়ে মারতে পারি। তখন তাদেরকে সাহায্য করার কেউ থাকবে না, একমাত্র আমাদের রহমত ছাড়া কেউ তাদের উদ্ধার করতে পারবে না। —সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াত-৪১-৪৩

আরেকটি সূরাতে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরে মানুষের অসহায়ত্ববোধ, আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া এবং বিপদমুক্তির পরে আবার উদাসীনতা সম্বন্ধে আরবদেরকে, বিশেষ করে কোরেশদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে ঃ

তারা যখন জাহাজে আরোহণ করে তখন খাস বান্দার মতই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে কিন্তু তারা যখন পুনরায় নিরাপদে কিনারায় এসে অবতরণ করে তখন দেখ ! তারা আল্লাহ্‌র সংগে অন্যকে শরীক করে।

সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত-৬৫

অপর একটি সূরাতে এটি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌র রহমতে জাহাজসমূহ সমুদ্র দিয়ে ভেসে চলে, যাতে রয়েছে তাঁর চিহ্নের পরিচয় ? বাস্তবিক প্রত্যেক বলিষ্ঠ, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে রয়েছে নিদর্শন। অমঙ্গলের ভীতি এবং পর্বতসমান তরঙ্গ যখন তাদেরকে তলিয়ে ফেলতে চায় তখন বাধ্য, সৎ বান্দার মত তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে। তিনি যখন তাদেরকে নিরাপদে কিনারায় পৌঁছে দেন তখন কেউ কেউ মধ্যপথ অবলম্বন করে এবং অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কেউ আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে না। —সূরা লুকমান ঃ আয়াত—৩১-৩২

আমরা আরো বিস্তারিত ও পরিষ্কার বর্ণনা পাই ইসরাঈলীয়গণের মধ্যে; যাদেরকে আল্লাহ প্রথমে তাঁর অশেষ রহমত দান করেছিলেন এবং তারপরে স্রষ্টার প্রতি মানুষের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয় ঃ

তোমাদের রব তো তিনি, যিনি সমুদ্র দিয়ে দ্রুতগতিতে জাহাজ চালনা করেন যাতে তোমরা তাঁর রহমত অনুসন্ধান করতে পার; নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি করুণাময়। এবং সমুদ্রের মধ্যে যখন তোমাদের উপর দুর্ভাগ্য আপতিত হয় তখন তোমরা যে মিথ্যা দেবদেবীর পূজা কর তাদের কথা ভুলে যাও, একমাত্র তাঁকে ছাড়া, অথচ তিনি যখন তোমাদেরকে নিরাপদে কিনারায় অবতরণ করিয়ে দেন তখন তোমরা ঘুরে যাও, এবং মানুষ চিরদিন অকৃতজ্ঞ। তোমরা কি তখন নিরাপদ যে, তিনি তোমাদেরকে শুকনা যমীন দ্বারা গ্রাস করাবেন না এবং

কংকর বর্ষণ দ্বারা তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবেন না ? এবং তখন তোমরা কাউকে রক্ষাকর্তারূপে পাবে না ! অথবা তোমরা কি নিশ্চিত যে, তোমাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে আবার তিনি তোমাদেরকে সমুদ্রে যাবার অবস্থা করবেন না এবং তোমাদেরকে ডুবিয়ে মারার জন্যে ঝড়-তুফানময় হাওয়া পাঠাবেন না ? তখন আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করার মত কাউকে পাবে না ! এবং আমরা আদম সন্তানদেরকে সম্মান দান করেছি, তাদের যমীনে ও সাগরে চলাচল করার জন্যে সুযোগ দান করেছি, এবং তাদেরকে ভাল সব জিনিস খাদ্যস্বরূপ প্রদান করেছি। —সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত—৬৬-৭০

নীচে উদ্ধৃত আয়াতটিতে আরো বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যায় :

তিনিই তোমাদেরকে যমীন ও সাগরে ভ্রমণ করান, তোমরা জাহাজে আরোহণ কর এবং মনোরম হাওয়ায় তোমাদেরকে নিয়ে পাল তুলে জাহাজ চলে এবং তারা তা উপভোগ করো, তারপর ভয়ংকর হাওয়ার কবলে পড়ে, চারদিক থেকে তরঙ্গ এসে তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তখন তারা নিশ্চিত জানে যে, তারা ঢেউয়ের তলায় ডুবে যাবে, তখন তারা সততার সাথে বাধ্য বান্দার মত আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে যে, "তুমি যদি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার কর তাহলে আমরা অবশ্যই শোকর গুযারকারী বান্দা হব।" কিন্তু তিনি যখন তাদেরকে রক্ষা করেন তখন তারা দুনিয়াতে উদ্ধত বান্দার মত বিচারবিহীন আচরণ করে। —সূরা ইউনুস : আয়াত—২২-২৩

কুরআন শরীফের চিরন্তন তথ্য থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পেঁছাতে পারি যে, সেমিটিক লোকেরা একেবারে সুপ্রাচীন প্যাট্রিয়ার্ক ইসরাঈলীয়দের কাল থেকেই সমুদ্রে চলাচল করত। বাইবেলেও এর সমর্থন পাওয়া যায় (ইসরাঈলীয় : ৭)। কুরআন শরীফে উত্তাল সমুদ্রে জাহাজের অবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে মানুষের অসহায়ত্বের একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। কথা দ্বারা যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সমগ্র আরবী সাহিত্যে তার তুলনা নেই। যিনি কুরআন শুনেছেন তিনি নিশ্চয়ই এই সব বিপদ সম্বন্ধে অবহিত আছেন এবং আল্লাহ্‌র অশেষ দয়ার অকাট্য প্রমাণের বিষয়েও সচেতন রয়েছেন। জাহাজ যত রকমের বিপদের ও দুর্যোগের সম্মুখীন হয় যাত্রিগণের শোক ও হাহাকার, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের ফরিয়াদ এবং বিপদমুক্ত হয়ে কিনারায় অবতরণের পরে আবার তাদের সবকিছু ভুলে যাওয়া ও অকৃতজ্ঞতা, যেসব ছিল আরব জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয়, তার সবকিছুরই পুঙখানুপুঙখ বর্ণনা রয়েছে।

আরো কয়েকটি সূরাতে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, আরবরা ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরের মধ্য দিয়ে জাহাজ চালানোর কায়দা জানত এবং তারা বহু দূরের দেশসমূহে যেত। ভয়ানক তুফানের মধ্যে কেমন করে জাহাজ চালাতে হয় তা তারা জানত। তারা তুফানের আগমন সংকেত বুঝতে পারত এবং দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে নিকটবর্তী কোন্ স্থানে দ্রুত গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে তা-ও তাদের জানা ছিল। বিভিন্ন হাওয়ার গতি সম্বন্ধেও তারা ছিল অবহিত। মরুভূমি ও উপকূলবর্তী এলাকাতেই তাদের চলাচল ছিল বলে স্বাভাবিকভাবেই তারা ঝড়ের পূর্বলক্ষণ বুঝতে পারত। আরব নাবিকদের মতে বারো প্রকারের হাওয়া ছিল : দক্ষিণা হাওয়া جنوب উত্তরে হাওয়া شمال, পশ্চিমা হাওয়া قبول, পাবালি হাওয়া دبور, দক্ষিণা হাওয়া نعامی, উত্তরে হাওয়া محوة, উত্তর-পূর্ব হাওয়া نكباء, দক্ষিণ হাওয়া داجن, অন্ধকার হাওয়া ازيب, খোশ হাওয়া بارخش, উত্তরে হাওয়া وجف, এবং উত্তরে হাওয়া صاروف।, বিভিন্ন হাওয়ার প্রকৃতির জন্যে আরবরা ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করত। হাওয়া চলাচলের জ্ঞান ও নৌ-চালনাবিষয়ক জ্যোতির্বিদ্যা তারা ভালবাসত এবং বিষয় দু'টি সম্বন্ধে আরবীতে লিখা অনেক বই-ও রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই 'কিতাব উল-আমওয়া'-এর লেখক হচ্ছেন, আবু হানিফা দিনাওরী (ওফাত ২৮২ হি.)।

কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে :

এবং তাঁর নিদর্শনের অন্যতম পরিচয় হল এই যে, তিনি সুসংবাদ বহনকারী হাওয়া পাঠান, এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়ে তাঁর দয়ার স্বাদ গ্রহণ করান, এবং জাহাজসমূহ তাঁর হুকুমে পরিচালিত হয় যাতে তোমরা তাঁর রহমত চাইতে পার এবং তোমরা শোকর গুযারী করতে পার।

—সূরা রুম : আয়াত-৪৬

সমুদ্র যাত্রার একটি চিত্র :

অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তিনি তোমাদের পুনরায় সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের কুফরীর জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না। তখন তো তোমরা কোন সাহায্যকারী পাবে না।

—সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৬৯

তোমরা জাহাজে আরোহণ কর এবং মনোরম হাওয়ায় তোমাদেরকে নিয়ে পাল তুলে জাহাজ চলে এবং তারা তা উপভোগ করে। তারপর

ভয়ংকর হাওয়ার কবলে পড়ে, চারদিক থেকে তরঙ্গ এসে তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

—সূরা ইউনুস।

জাহাজ সমুদ্রে চলমান হবার পরের অবস্থারও বর্ণনা রয়েছে কুরআন শরীফে :

আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে, দিন ও রাত পরিবর্তনে, যে মানুষের হিত সাধন করে সেগুলোসহ সমুদ্রে বিচরণশীল জাহাজগুলোতে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে বারি বর্ষণ দ্বারা মাটিকে আবার জীবন দান করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীব জন্তুর বিস্তারণে বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে বুদ্ধিমান জাতির জন্য রয়েছে নিদর্শন। —সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৪

দিনে ও রাতে একটানা জাহাজ চলত সাগরে। দিনের বেলা নাবিকেরা নৌপথ ধরে এবং উপকূলভূমি অনুসরণ করে চলত আর রাতে চলত তারার সাহায্যে পথ নির্ণয় করে। আরবরা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তাদের কাব্যে সে রকম প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। তারা বিভিন্ন দেশের নাম অনুসারে তারার নামকরণ করত আবার তারার দিক অনুযায়ী দেশেরও নামকরণ করত। سهيل (অগস্ত্য তারা), شعرى (বড় কুকুর) زهره (শুকতারা বা শুক্র গ্রহ), فرقدين ثريا (কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ), ইত্যাদি অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র তারা সচরাচর কাজে লাগাতো। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের অস্তগমনের সঙ্গে ঋতুর যে পরিবর্তন হত তাও তারা জানত।

জ্যোতির্বিদ্যায় আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের যে পরিচয়, তা কুরআন শরীফ থেকেও পাওয়া যায় :

এবং তিনি পৃথিবীতে নোঙরসমূহ স্থাপন করেছেন যাতে তোমাদের সমেত তা সরে না যায় এবং নদী ও পথসমূহ স্থাপন করেছেন যাতে তোমরা চলাচল করতে পার, এবং অনুরূপভাবে তিনি নিদর্শনসমূহ সৃষ্টি করেছেন যেগুলো দেখে মানুষ পথ চিনে চলতে পারে এবং তারা তারকা দ্বারাও পরিচালিত হয়। — সূরা নাহল : ১৫-১৬

তিনিই তারকারাজিকে তোমাদের জন্যে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা যমীনে বা সাগরে অন্ধকারের মাঝে পথ চিনে চলতে পার। আমাদের নিদর্শনসমূহ আমরা পরিষ্কারভাবে প্রদর্শন করেছি সেই সব লোকের জন্যে যারা বুঝতে পারে। — সূরা আনয়াম

আর তুফান ও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অন্ধকার রাত্রে যখন আসমানে কোন তারাও দেখা যেত না তখন সেই দুঃসময়ে নাবিকদের যে কি অসহায় অবস্থা হত তা অনুমেয়। সেই ঘোর বিপদের সময়ের বর্ণনা রয়েছে কুরআন শরীফে :

অথবা গভীর সমুদ্রের অন্ধকারে যখন ঢেউয়ের উপর ঢেউ উঠতে থাকে, যার উপরে থাকে মেঘরাশি, যার ফলে অন্ধকারের উপরে অন্ধকার হয়, তখন কেউ নিজের হাত প্রসারিত করলে তাও দেখতে পায় না। এবং আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্য কোন জ্যোতিই নেই।

—সূরা নূর : আয়াত ৪০

কুরাইশ এবং আরবদের যদি সমুদ্রযাত্রার অনুরূপ অভিজ্ঞতা না থাকত তাহলে এ রকম উপমা তাদের প্রতি প্রযোজ্যই হতে পারত না।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে একমাত্র আল্লাহ্ই আরব নাবিকদেরকে পরিচালিত করতেন, আর তার কৃতজ্ঞতা ছিল অশেষ। সে সময়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রতি তাদের গভীর বিশ্বাসের পরিচয় পবিত্র কুরআনে বিধৃত রয়েছে :

যিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন এবং তার মধ্যে দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত করেছেন, এবং অনড় পর্বতমূহ স্থাপন করেছেন এবং দুই সাগরের মাঝে একটি বাধার সৃষ্টি করেছেন। আসল আল্লাহ্র সমকক্ষ কি আর কোন আল্লাহ্ থাকতে পারে? তাদের অধিকাংশই জানে না। তিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাক শোনেন যদি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁকে ডাকে এবং তার উপর থেকে দুঃসিবত দূর করে দেন, কে তোমাদেরকে দুনিয়াতে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেছেন? আর কোন আল্লাহ্ আছেন কি যিনি আসল আল্লাহ্র সমতুল্য হতে পারেন? কত অল্প লোকেই না এ সব বিবেচনা করে থাকে! অন্ধকার যমীন ও সাগরের পথে কে তোমাদের পরিচালিত করেন এবং তার করুণার অগ্রদূত হিসেবে হাওয়াকে পাঠান যা মেঘসমূহকে উড়িয়ে নিয়ে যায়? এই সকল ষড়যন্ত্রকারীরা যাকে আল্লাহ্র সহযোগী বলে বিবেচনা করে আল্লাহ্ সে অংশীদারিত্বের অনেক উর্ধ্বে। —সূরা নামল : আয়াত ৬০-৬৩

এর পরেও আবার আমরা পাই :

বল, কে তিনি যিনি তোমাদেরকে যমীন এবং সাগরের বিপদ থেকে রক্ষা করেন যখন তোমরা নিজেদেরকে হেয় ও অসম্মানিত করে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁকে ডাক। তিনি যদি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করেন তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বল, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা থেকে এবং সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, কিন্তু তার পরেও তোমরা তাঁর সঙ্গে অংশীদার স্থির কর। —সূরা আনয়াম : আয়াত ৬৩-৬৪

এসব বর্ণনা থেকে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আরবদের ব্যাপক নৌ-চালনার অভিজ্ঞতা ছিল এবং সাগরের বিভিন্ন দৃশ্য স্বচক্ষে দেখারও অভিজ্ঞতা তাদের ছিল।

এক

রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর আমলে আরব নৌবহর

যে সময়ের কথা দিয়ে শুরু করছি তখন অজ্ঞানতার যুগের কালোমেঘ দূরীভূত করে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল সূর্য দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়েছে, কিন্তু তার আলোক তখন পর্যন্ত আরব সমাজে বিচ্ছুরিত হয়নি। পুরানো রীতিনীতি তখনো রয়ে গেছে এবং প্রচলিত সব কিছুতেই তখনো প্রাক-ইসলামী আরব জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন বিরাজিত। মরুবাসী লোকেরা তাদের জাহাজে চড়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে চলাচল করছে। সমুদ্র তীরবর্তী আবিসিনিয়া তাদের নিকট দ্বিতীয় মাতৃভূমিস্বরূপ ছিল এবং তারা যখন খুশী তখনি সেখানে যাতায়াত করত। লোহিত সাগরে চলতে রোমীয় জাহাজ এবং ইসলামের অভ্যুদয়ের স্বল্পকালমাত্র আগে জেদ্দার কাছে তাদের একটি বাণিজ্যপোত বিধ্বস্ত হয়। কুরাইশরা রোমকদের কাছ থেকে সেই জাহাজের তক্তাগুলো কিনে নিয়ে সেগুলো দিয়ে কাবার ছাদ তৈরী করে।[১]

মক্কাতে মুসলমানগণের জীবন যখন অসহনীয়ভাবে অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মুসলমানগণকে আবিসিনিয়াতে হিজরত করার উপদেশ প্রদান করেন। তদনুযায়ী নবুওতের পঞ্চম বছরে এগারো জন পুরুষ ও চারজন নারীর একটি দল তাঁদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে জেদ্দাতে গিয়ে দেখতে পান যে, দুইটি সওদাগরী জাহাজ আবিসিনিয়া যাবার জন্যে তৈরী আছে। কুরাইশরা তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।[২] আবিসিনিয়াতে তাঁদের নিকট মিথ্যা সংবাদ পাঠানো হয় যে, কুরাইশরা সবাই ইসলাম কবুল করেছে। তখন সেখান থেকে কয়েকজন মুসলমান তাড়াতাড়ি মক্কাতে ফিরে আসেন, কিন্তু আটজনকে আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করতে হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরত করেন তখন আবিসিনিয়া থেকে কয়েকজন মুসলমান সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমর

১. "সীরাত ইবন হিশাম," কা'বার বর্ণনা অংশ।
২. "তারিখ তাবারী", ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮২।

ইবন উমাইয়া যামরীর মারফত আবিসিনিয়ার শাসককে মুবারকবাদ জানিয়ে একখানি চিঠি পাঠান। উত্তরে আবিসিনিয়ার শাসক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ৬০ জন লোকের একটি দল পাঠান, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের বহনকারী জাহাজ কিনারায় পৌঁছতে পারেনি।[১] ৭ম হিজরীতে আবিসিনিয়াতে হিজরতকারী কুরাইশগণ মদীনার উদ্দেশ্যে জাহাজে আরোহণ করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিবি হযরত হাবীবা (রাঃ)-ও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। আবিসিনিয়ার শাসক দুইটি জাহাজে করে তাঁদের পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তাঁরা এলা (ওকবা) থেকে দশ বিশ্রামের দূরবর্তী লোহিত সাগরের আরব উপকূলবর্তী 'জার'-এ পৌঁছান।[২] সেখান থেকে মদীনা ছিল একদিনের পথ।[৩]

আশার গোত্রের প্রায় ৫২ জন নও-মুসলমান ইয়ামান থেকে মদীনাগামী একটি জাহাজে করে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিকূল হাওয়া জাহাজটিকে আবিসিনিয়াতে নিয়ে যায়। সেখানে মক্কা থেকে আগত মুসলমানগণ তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং ৭ম হিজরীতে তাঁদের সঙ্গে একত্রে একটি জাহাজে করে মদীনা রওনা হয়ে মুসলমানগণের খায়বর বিজয়কালে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। এঁদের নামকরণ হয়েছিল "জাহাজের লোক" বলে।[৪]

এ হল পূর্বদিকের সাগর। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরেও আরবদের চলাচল ছিল। সিরীয়ার সীমান্তে বসবাসকারী লাখাম ও জাযাম গোত্রের লোকেরা রোমীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, রোমীয়রা তাদেরকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে প্রভাবিত করে। তামীম দারী নামক জনৈক ব্যক্তি পরবর্তীকালে ইসলাম কবুল করেন এবং মদীনাতে আগমন করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, লাখাম ও জাযাম গোত্রের ত্রিশজন লোক নিয়ে তিনি জাহাজে আরোহণ করেন; কিন্তু প্রতিকূল বাতাসের কারণে তাঁরা এক সাগরে একমাস যাবত নোঙর করে থাকেন। জাহাজ ডুবে যায়; কিন্তু তাঁরা জাহাজের সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট নৌকায় উঠে পড়েন এবং দ্বীপে পৌঁছান।

উপরিউক্ত ঘটনা সিরিয়ার সাগরে ঘটেছিল নাকি ইয়ামান সাগরে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু লাখাম ও জাযামের উল্লেখ থেকে বুঝা যায় যে, তা সিরিয়ার সাগরে ঘটেনি।

১. "তারিখ তাবারী" পৃঃ ১৫৭০।
২. ঐ পৃঃ, ১৫৭১।
৩. ইয়াকুত, "জার" অধ্যায়।
৪. সহীহ্ মুসলিম, "ফায়াইলুল-আশারিঈন।"

এ সকল বিস্তারিত বর্ণনার পরে আমি বিখ্যাত খৃস্টান লেখক জুরজি যায়েদান রচিত 'আত-তমদ্দুনুল-ইসলামী' প্রথম খণ্ড, (আসাতীলুল-বাহার অংশ) থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করতে চাই ঃ

> ইসলাম-পূর্ববর্তী যুগে আরবরা সমুদ্র যাত্রায় অভ্যস্ত ছিল না। তবে ইয়ামানের বাদশাহগণের সঙ্গে সাবা ও হুমায়ের-এর যোগসূত্র ছিল বলে তাদের কিছু নৌকা ছিল, কেননা জল ও স্থল উভয় পথেই তাদের বাণিজ্য চলত। কিন্তু হিজাযের লোকেরা নদী পথে ভ্রমণকেও ভয় করত আর সমুদ্রে যেতে তারা সাহসই পেত না।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহের জরীপের আলোকে এই মন্তব্যটিকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ইসলাম আরবগণকে নতুন ধর্ম এবং নতুন সভ্যতার রহমত দান করে। আরবদের বিশৃংখল ও বিধ্বস্ত শক্তিকে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মিলিত ও যুক্ত করে তাদেরকে একক জাতিসত্তায় পরিণত করে এবং তাঁদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক মতাদর্শে এক নতুন অগ্রগতি প্রদান করে।

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনকালে ইসলাম আরব দেশের সীমানার বাইরে বিস্তার লাভ করেনি। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর শাসনের দুই বছরের মধ্যে তা ইরাক এবং সিরীয়াতে বিস্তার লাভ করে এবং হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে একদিকে পারস্য ও পারস্য উপসাগরবর্তী এলাকাসমূহে এবং অন্যদিকে লিবিয়া ও প্যালেস্টাইন অতিক্রম করে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়াতে বিস্তৃত হয়। এ দুটি ছিল বিশ্বের দুই বড় নৌ-কেন্দ্র।

পারস্য উপসাগরের একটি প্রাচীন বন্দরের নাম ছিল 'ওবুল্লা'। এটি ছিল পারস্যের নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্র। এই বন্দর থেকে মালামাল ও বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে জাহাজ হিন্দুস্তান ও চীনে যেত। ভূমধ্যসাগরের তীরে আলেকজান্দ্রিয়ারও একই গুরুত্ব ছিল। এখান থেকে কনস্টান্টিনোপল, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপ যাবার গুরুত্বপূর্ণ পথ ছিল। এ সকল স্থান পর্যন্ত পৌঁছে আরব বিজয়ীগণ আরো সামনে অগ্রসর হবার জন্যে ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন, কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) তাঁদের তা করতে দেননি। দ্বিতীয় খলীফা যে সমুদ্রযাত্রার ভয়হেতু নিষেধ করেছিলেন তা নয়। একটি কাহিনী থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ তিনি সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তাঁর একজন কর্মকর্তা বর্ণনা করেছিলেন, "(জাহাজে) একজন মানুষকে দেখায় যেন কাঠের উপরে দাঁড়ানো একটা পোকা।" আসল কারণ ছিল আরবদের নৌ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না। অপরপক্ষে পারসিক ও রোমকরা

নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল। এ কারণেই আরব নৌবহর বাহরাইনের মধ্য দিয়ে পারস্যের একটি প্রদেশ ফারস্-এ অভিযান করলে তা ব্যর্থ হয় এবং আরবরা মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়। সে সময়ে বাহরাইনের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন আলা ইবন আল-হাযরামী। তিনিই এই অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই ধৃষ্টতাপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত হয়ে হযরত উমর (রাঃ) বিরক্ত হয়েছিলেন।

এ সময়ে মিসর ও সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)ও নৌপথে রোমীয়দের আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু "হযরত উমর (রাঃ) তা সমর্থন করেননি এবং তাঁকে অনুরূপ কারণে আলোকে প্রদত্ত শাস্তির কথা স্মরণ করতে বলেন"।[১] তবু আলা ইবন আল-হায্‌রামী পরিচালিত যুদ্ধই আরবদের প্রথম নৌযুদ্ধ। তিনি বাহরাইনে নৌ-সমরসজ্জা করে সমুদ্রপথে ফারস্ জয় করেন। কিন্তু পারসিকরা সমুদ্র তীরের দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে এবং সামনের পথও অবরুদ্ধ করে দেয়। পরে সাহায্য-কারী সেনাদল স্থলপথে অগ্রসর হয়ে গিয়ে নৌসেনাদের উদ্ধার করে এবং অতঃপর শহরটি বিজিত হয়।

লোহিত সাগরের সংগে নীল নদের সংযোগ

কিন্তু মুসলিম আরবগণের শান্তিপূর্ণ নৌযাত্রা শুরু হয় হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে। ১৮ হিজরীতে আরবে এক মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন উমর (রাঃ) মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু স্থলপথে আরবে খাদ্য আমদানী করাটা ছিল দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। তাই খলীফা নীল নদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত ৬৯ মাইল দীর্ঘ খাল খনন করান। ছয় মাসের পরিশ্রমে এ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। অতঃপর আর-বের জন্যে বিশটি জাহাজ শস্য বোঝাই করে প্রথম বছরেই রওয়ানা হয়ে যায় এবং যথাসময়ে মদীনার নিকট তৎকালীন বন্দর জার-এ নিরাপদে গিয়ে নোঙর করে।

এই খালটি মিসর ও আরবের মধ্যেকার নৌ-বাণিজ্যকে বিশেষ উৎসাহ জোগায় এবং হযরত উমর ইবন আবদুল আজিজ (রঃ)-এর সময় পর্যন্ত (১০০ হি.) এটি ব্যবহৃত হতে থাকে। পরে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাফি-লতিতে খালটির স্থানে স্থানে মাটি আটকে বন্ধ হয়ে যায়। আব্বাসীয় খলীফা মনসুর রাজনৈতিক কারণে খালটির ব্যবহার বন্ধ করে দেন; কিন্তু পরে আবার এটি খোলা হয় এবং দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহৃত হয়।[২]

---

১. তাবারী, ১৭ হিজরীর ঘটনাবলী, পৃ. ২৫৪৬।

২. মাকরিযী ও হুসনুল-মুহাদারাহ্ ঃ নহর আমীরুল-মুমিনীন অধ্যায়।

সুয়েজ খালের পরিকল্পনা

মিশরের শাসনকর্তা হযরত আমর ইবন আস (রাঃ)-ই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি সুয়েজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে খাল কেটে লোহিত সাগরের সঙ্গে ভূমধ্য-সাগরের সংযোগ সাধনের কথা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু খলীফা হযরত উমর (রাঃ) তা সমর্থন করেননি। আবুল ফিদা তাঁর ভূগোল গ্রন্থে ইবন সাঈদ মাগরাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন ঃ "ফারমা থেকে লোহিত সাগর ও ভূমধ্য-সাগরের দূরত্ব হল ৬০ মাইল। ইবন সাঈদ বলেন যে, আমর ইবন আস এই দুই-এর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে যানাবুত-তিমসাহ্ নামক স্থান পর্যন্ত একটি খাল খনন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হযরত উমর (রাঃ)তাঁর সে পরিকল্পনা সমর্থন করেন নি। দূরদর্শী উমর (রাঃ) সম্ভবত যে মারাত্মক পরিণামের কথা চিন্তা করে হযরত আমর ইবন আস (রাঃ)-এর পরিকল্পনা বাতিল করে-ছিলেন তা আজ প্রাচ্যের যে কোন স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন লোকের নিকটেও সহজে বোধগম্য।[১]

পূর্বোল্লেখিত ওবুল্লা ছিল পারস্য উপসাগরের একটি বন্দর। আরবরা ১৪ হিজরীতে এটি দখল করে। হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে দুটি গুরুত্ব-পূর্ণ বাণিজ্য বন্দর তাদের দখলে আসে; লোহিত সাগরের আরব উপকূলে অবস্থিত জার এবং পারস্য উপসাগরের কূলে ওবুল্লা।

জার

এটি সম্ভবত আধুনিক ইয়ানবো-এর কাছাকাছি লোহিত সাগরের আরব উপকূলে অবস্থিত ছিল। ৭ম হিজরীতে যে সকল মুসলমান আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন তাঁরা এখানে নেমেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই এটি বেশ সুপরিচিত ছিল। হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে যখন মিসর ও সিরিয়া মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয় তখন এটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং নীল নদের সঙ্গে লোহিত সাগরের সংযোগ সাধনের ফলে এর গুরুত্ব আরো বেশী বৃদ্ধি পায়। আবি-সিনিয়া, মিসর, এডেন, হিন্দুস্তান ও চীন থেকে খাদ্যশস্য ও বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে জাহাজ এতে ভিড়ত। ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্থাপত্যের জন্যে খ্যাতি লাভ করে।

জারের বিপরীত দিকে কারাফ নামে এক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে একটি দ্বীপ ছিল। নৌকা দ্বারা সেখানে যাতায়াত করা যেতো এবং আবিসিনিয়া

---

১. তাকিবমুল বুলদান, আবুল ফিদা কৃত; পৃ. ১০২ (প্যারিস সংস্করণ)।

থেকে আগত জাহাজও সেখানে ভিড়ত। জারের মত সেখানেও সওদাগরদের বসতি ছিল।

ওবুল্লা

দজলা (টাইগ্রীস) নদীর পাড়ে বসরার সামান্য উপরে এটি অবস্থিত ছিল। এখানে একটি সেনানিবাস ছিল এবং ইরানী আমলে চীন ও হিন্দুস্থান থেকে বাণিজ্য জাহাজ এসে এখানে ভিড়ত।[১] আরবরা ১৪ হিজরীতে এটি দখল করে এবং ২৫৬ হিজরী পর্যন্ত এর গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, অতঃপর আবিসিনীয়দের হাতে ধ্বংস হয়।[২]

বসরা

দজলা ও ফোরাত একত্রে এসে মিশেছে বর্তমানে কারনা নামে খ্যাত স্থানে এবং শাতিল-আরবের নিকটে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। ১৪ হিজরীতে উমর (রাঃ)-এর আদেশে স্রোতোধারার মাঝামাঝি স্থানে বসরা নগর স্থাপন করা হয়। অবস্থানের কারণে এর গুরুত্ব অতি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ৯৭ হিজরীতে আরবরা সিন্ধু দখল করলে তখন সিন্ধু ও বসরার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমল

আরব নৌবহর সত্যিকারের অর্থে গৌরব অর্জন করে উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে। প্রথম আরব নৌবাহিনী প্রধান (আমীরুল-বহর) হন আবদুল্লাহ বিন কায়েস হারিসী। ২৮ হিজরী থেকে শুরু করে তিনি রোমীয়দের বিরুদ্ধে পঞ্চাশটি নৌ-অভিযান পরিচালনা করেন। রোমকরা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু একটি অভিযানে তিনি তাঁর মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, তখন একটি ক্ষুদ্র নৌকায় একাকী ভূমধ্যসাগর দিয়ে যাওয়ার সময়ে রোমকরা তাঁকে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে। ২৮ হিজরীতে আরবরা সাইপ্রাস জয় করে। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সুরাহ[৩] যথাক্রমে সিরীয় ও মিসরীয় নৌ-বাহিনী পরিচালনা করেন এবং আরবরা এক এক করে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপসমূহ দখল করে নেয়।

একই সময়ে পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরে নৌবহরের চলাচল শুরু হয়। আলা ইবনুল-হাযরামীর পরে হযরত উমর (রাঃ) উসমান ইবন

১· "আখবারুত-তুয়াল", আবু হানিফা দিনাওরি কৃত।
২· "তারিখ-ই-বসরা", আজমী কৃত, পৃ· ১১ (বাগদাদ সংস্করণ)।
৩· তাবারী, ২৮ হিজরী।

সাকাফীকে ওমান ও বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত করেন। উসমান তাঁর ভাই হাকামকে প্রতিনিধি হিসেবে বাহরাইন পাঠান। বাহরাইন পূর্ব দেশীয় বাণিজ্য জাহাজসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পথ ছিল বিধায় হাকাম একটি নৌবহর গঠন করেন এবং বহরের একাংশ হিন্দুস্তানে প্রেরণ করেন। বোম্বাই-এর নাম তখন কেউ জানত না। হাকামের নৌবহর থানা লুন্ঠন বাহরোচে আরো একটি অভিযান পরিচালিত হয় এবং তারপর মুগিরা ইবন আবিল-আসকে সিন্ধুর বন্দর দাইবাল (থাট্টা) আক্রমণের জন্যে পাঠানো হয়।[১] এ থেকে বুঝা যায় যে, আরব নাবিকগণ হয় এই 'শহরগুলোর অবস্থান জানতেন আর নয়তো এগুলোর অবস্থান জানার জন্যে তারা ইরানী নাবিকগণের সাহায্য গ্রহণ করতেন।

হিন্দুস্তানে আরব অভিযান যে সাকাফী গোত্রীয় তরুণদের উদ্যোগে শুরু হবে এবং সেই একই গোত্রের এক তরুণ মুহাম্মদ ইবন কাসিম দ্বারা সমাপ্ত হবে তা নেহায়েত ঘটনাক্রম। মুহাম্মদ ৯২ হিজরীতে সমগ্র সিন্ধু পদানত করেন।

---

১. "ফুতুহুল-বুলদান", পৃ. ৪৩১-৩২ ও "মু'জামুল-বুলদান", প্রবন্ধ "বাহরাইন", তারিখ নির্ণয় সাপেক্ষ।

দুই

উমাইয়া আমল

প্রথম চার খলীফার শাসনের অবসানে উমাইয়াগণ দামেশ্‌কে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁরা নৌ-চলাচলের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেন। তার কারণ ছিল এই যে, রোমীয়রা ৪৯ হিজরীতে সিরীয়ার উপকূল আক্রমণ করে। কাজেই মুয়াবিয়া তাদের প্রতিহত করার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আরবদের তখন পর্যন্ত মাত্র একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল মিসরে। সিরিয়াতেও অনুরূপ একটি কারখানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন সিরিয়ার উপকূলে জাহাজ তৈরী করার জন্যে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় আক্কাতে। অতঃপর আমীর মুয়াবিয়া রোমক আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন। সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে তিনি ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলো দখল করে নেন এবং সেগুলোতে সেনা সন্নিবেশিত করেন। তারপর তিনি সিসিলী আক্রমণ করেন এবং তাঁর আদেশে জানাদা ইবন আবি উমাইয়া আযদী (ওফাত ৮০ হি.) ৫২ হিজরীতে রোডস দখল করে সেখানে আরব বসতি স্থাপন করেন। ৫৪ হিজরীতে জানাদা কনস্টানটিনোপলের নিকটবর্তী ইরওয়াদ নামক দ্বীপ পদানত করেন এবং তারপর ক্রীট জয় করেন।[১]

আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান তিউনিসে একটি বিশাল জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন।[২] তাঁর শাসনামলে ৭৫ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইরাক থেকে তুর্কিস্তান ও সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের শাসক নিযুক্ত হন। হাজ্জাজের চল্লিশ বৎসরের শাসনামলের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাচ্য দেশসমূহের সাগরে অত্যন্ত সমৃদ্ধ আরব বাণিজ্যের প্রসার। আরব বাণিজ্য নৌবহর সুদূর সিংহল দ্বীপ পর্যন্ত যেতো। এদের মধ্যে কয়েকটি জাহাজ ভারতীয় জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়।

---

১. "বালাযুরী", পৃ. ২২৬।
২ ইবন খালদুন, "মুকাদ্দামা" পৃ. ২১০।

তখন হাজ্জাজ প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যে জল ও স্থল উভয় পথে সিন্ধু আক্রমণ করেন; এভাবে সিন্ধু স্থায়ীভাবে বিজিত হয়।[১]

হাজ্জাজের পূর্ববর্তীকালে পারস্য উপসাগর ও সিন্ধু নদে চলাচলকারী জাহাজের গায়ের কাঠ রশি দিয়ে বাঁধা থাকত; কিন্তু ভূমধ্যসাগরে চলাচলকারী জাহাজের গায়ের কাঠ লোহার পেরেক ও কাঁটা দিয়ে লাগানো থাকত। হাজ্জাজ এই শেষোক্ত রকমের জাহাজ তৈরী করান এবং গায়ের ছিদ্র বন্ধ করার জন্যে তেলের বদলে আলকাতরা ব্যবহারের প্রচলন করেন। তিনি সরু গলুই-পাছাওয়ালা নৌকার বদলে সমান্তরাল নৌকাও ব্যবহার করেন।

আক্কার জাহাজ নির্মাণ কারখানাটি আবদুল মালিকের সময় পর্যন্ত চালু ছিল। হিশাম কারখানাটি আক্কা থেকে সুর-এ স্থানান্তরিত করেন। ওয়াকিদীর মতানুসারে মুয়াবিয়া থেকে ইয়াজিদের কাল পর্যন্ত জাহাজ আক্কাতেই ছিল, কিন্তু মারওয়ান পরিবারের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সব জাহাজ সুর-এ নিয়ে যাওয়া হয়; মুতাওয়াক্কিলের আমল পর্যন্ত (২৪৭ হি.) জাহাজ সেখানেই থাকে।[২]

হিন্দুস্তানে নৌ-অভিযান

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, হিন্দুস্তান বার বার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু ইউরোপীয়রা ছাড়া আর কেউ সমুদ্র পথে আক্রমণ করেনি—এ ধারণাটি সত্য নয়। আরবরা জল ও স্থল উভয় পথেই হিন্দুস্তানে অভিযান করেছিল। হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলে যে থানা, বাহরোচ ও থাট্টা আক্রমণ করা হয়েছিল তা ছিল নৌ-অভিযান। পুনরায় ৯৩ হিজরীতে সিন্ধু অভিযানকালে মুহাম্মদ ইবন কাসিম তাঁর সেনাদলের একাংশ নিয়ে যদিও শিরাজের মধ্য দিয়ে মাকরান হয়ে সিন্ধুতে এসেছিলেন, তাঁর সেনাদলের অপর অংশ খাদ্যশস্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছিল সমুদ্রপথে। তিনি থাট্টা বন্দর (দাইবাল) অধিকার করে সামনে অগ্রসর হন।[৩] পরে সমুদ্র পথেও তাঁকে সামরিক সাহায্য করা হয়। ১০৭ হিজরীতে জুনাইদ ইবন আবদুর রহমান আল-মুররী সিন্ধুর শাসক নিযুক্ত হলে তিনি রাজা জয়সিয়ার সঙ্গে এক নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং মনডল ও বাহরোচ অধিকার করেন। হাবীব ইবন মুররাহের অধীনে

---

১. ইবনে রুসতা, "আল-আলাকুন-নাফিসা, পৃ. ১৯৫-৯৬।
২. "ফুতুহুল-বুলদান" পৃ. ১১৭-১৮।
৩. ঐ, পৃ. ৪৩৬।

তাঁর সেনাদলের অপর অংশ মালওয়া (মালব) আক্রমণ করে উজ্জয়িনী (উযাইন) দখল করেন। জুনাইদ সম্ভবত গুজরাটও জয় করেছিলেন, কেননা বালাযুরী বলেন, "এবং জুনাইদ বাইলামান ও গুজরাট জয় করেন।" (পৃ· ৪৪২)

উমাইয়া আমলে সেচকার্য ও নৌ-চলাচলের জন্যে অনেক খাল খনন করা হয়। ইসতাখারী[১] বলেন যে, বিলাল ইবন আবি বুরদার সময়ে বসরায় ও তার আশেপাশে ১০ লক্ষ ২০ হাজার খাল ছিল, সেগুলোতে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করত।

এগুলো ছিল উমাইয়া শাসকগণের শেষ কীর্তি। তাঁদের পতনের পর আব্বাসীয় খলীফাগণ রাজদন্ড ধারণ করেন এবং সিরিয়া থেকে ইরাকে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ফলে তাঁরা পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের নিকটবর্তী এলাকায় চলে আসেন।

১· লাইডেন সংস্করণ, পৃ· ৮০

তিন

আব্বাসীয় আমল

দজলা, ফোরাত এবং পারস্য উপসাগর রাজধানীর নিকটবর্তী হওয়া হেতু আব্বাসীয় খলীফাগণের পক্ষে প্রাচ্যের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্য ও যোগাযোগ স্থাপন করা সুবিধাজনক হয়। ১৫২ হিজরীতে খলীফা মনসুর যখন দজলা (টাইগ্রীস) নদীর তীরে বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন তখন শহরের প্রত্যেকটি প্রাসাদের সঙ্গে জলপথের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। রাজধানীর স্থান নির্বাচন করা হয় শুধু এই বিবেচনায়—যাতে দজলা ও ফোরাত নদীর মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। আব্বাসীর শাসনের গৌরবময় আমলের প্রাচীন ঐতিহাসিক ইবন ওয়াদিহ্ ইয়াকুবী (২৭৭ হি.) লিখেন: "মনসুর এই স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন। কারণ এটা সত্যিকার অর্থে দজলা ও ফোরাত নদী দুটির মধ্যবর্তী একটি দ্বীপ। পূর্বে দজলা আর পশ্চিমে ফোরাত, এ দুটি গোটা পৃথিবীর ঘাট। ওয়াসিত, বসরা ওবুল্লা, আহ্ওয়াজ, ইরান, ওমান, ইয়ামামা, বাহরাইন এবং তাদের সন্নিহিত এলাকা থেকে যে কোন সম্পদ আসত তা দজলা দিয়ে আসতেই হত এবং সেই সব জাহাজকে দজলাতে নোঙর গাড়তেই হত। অনুরূপভাবে মসুল, রাবীয়া আজারবাইজান এবং আর্মেনীয়া থেকে আগত জাহাজকেও অবশ্যই দজলাপথে আসতে হত এবং মুদার, রাক্কা, সিরিয়া ও সিরিয়ার বিভিন্ন বন্দর, মিসর এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত জাহাজও ফোরাত নদীপথে অবশ্যই এখানে আসতো।

শহরটির নৌ ও বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে ফোরাত নদী থেকে একটি খাল কেটে সওদাগরদের মহল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করে দেয়া হয়। সমুদ্র থেকে সওদা বোঝাই জাহাজ ফোরাত নদীতে আসতো। নদী থেকে কারখাইয়া খালে প্রবেশ করতো, সেখান থেকে একটি কৃত্রিম খালপথে শহরে প্রবেশ করতো শহর থেকে সওদাগরদের মহল্লায় গিয়ে সেখানে মালপত্র খালাস করতো। এগুলো ছাড়াও অন্যান্য খাল ছিল এবং সেগুলোও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত, যেমন বহরের বা সাগরের খাল। ফোরাত থেকে বহির্গত এই

১. ইয়াকুবী "কিতাবুল-বুলদান," পৃঃ ২৩৮, ২৪৬ (লাইডেন সংস্করণ)।

খালটি খুব প্রশস্ত ছিল। রাক্কা, সিরিয়া ও মিসর থেকে আটা ও ময়দা বোঝাই বড় বড় জাহাজ এসে ভিড়তো। এর পাড়ে ছিল সওদাগরদের গুদাম ঘর। আর খালটি সব সময়ই বড় জাহাজ চলাচলের উপযোগী গভীর থাকতো।[১] বাগদাদের কাছে সারসার-এ একটি খাল ছিল, সেটিতেও নৌকা চলাচল করতো। ঈসা খাল থেকে ফোরাত নদী হয়ে জাহাজ আসতো দজলা নদীতে।

আব্বাসীয় আমলে আরবদের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকান্ড খুব বেশী বৃদ্ধি পায়। এর কারণ ছিল এই যে, উমাইয়া আমলে তাঁদেরকে যে বাধ্যতামূলক-ভাবে সামরিক ও বেসামরিক চাকরী করতে হত, আব্বাসীয় আমলে তা থেকে তাঁদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ১৩৩ হিজরী থেকে বেসামরিক চাকরীতে ইরানীরা নিযুক্ত হতে থাকে এবং কেবলমাত্র সামরিক চাকরীতেই আরবদের রাখা হয়। ২১৮ হিজরীর পরে মুতাসিমের শাসনামলে সামরিক পদে তুর্কীরা নিযুক্ত হয়। কাজেই আরবদের পক্ষে একমাত্র ব্যবসায় ছাড়া আর কোন সম্মানজনক জীবিকার পথ খোলা ছিল না। এই অসুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও সেই স্বল্পতম সময়কালে তাঁদের নৌ-ক্রিয়াকান্ড অকিঞ্চিতকর ছিল না।

উমাইয়াগণের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁরা সিন্ধু অধিকার করেন এবং সিন্ধু ও বসরার মধ্যে যথারীতি যোগাযোগ চলতে থাকে। ১৫৯ হিজরীতে আব্বাসীয় খলীফা মাহদীর শাসনামলে আরবরা আবদুল মুলক ইবন শিহাব আল-মাসমাঈ-এর অধীনে গুজরাটে অভিযান করে। ১৬০ হিজরীতে এই নৌ-সেনাদল গুজরাটের উপকূলীয় শহর বারবুদে পেঁছায়। বারবুদের আদি নাম ছিল বহরভূত (بهاربهوت), বাহুরোচের কাছে আজো স্থানটির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

এক শতাব্দীকাল পরে পর্যন্ত সিন্ধুর সংগে বাগদাদের খলীফাগণের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু তাঁরা আর কোন নৌ-অভিযান করেন নি। ফলে আস্তে আস্তে আরবরা এই এলাকায় নিতান্ত সওদাগর হিসেবে পরিচিত হয়ে পড়ে। তাদের জাহাজ ইরাক ও আরবের বন্দরসমূহ থেকে পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর, চীন সাগর, লোহিত সাগর এবং আবিসিনিয়া সাগরে চলাচল করতে থাকে।

---

১. "কিতাবুল-বুলদান," পৃ. ২৫০।
২. "ইসতাখারী," পৃ. ৮৫।
৩. "ইবন আসির," ১৬০ হিজরীর ঘটনাবলী এবং "ইবন খালদুন," ৩য় খন্ড, পৃ. ২০৮।

ভূমধ্যসাগরের পাড়ে তিউনিস উমাইয়াগণের আমল থেকেই একটি নৌকেন্দ্র ছিল। আব্বাসীয়গণের আমলেও তা অক্ষুন্ন ছিল। রোমানদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটি। আব্বাসীয় নৌবহর এখান থেকে রওনা হয়ে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপসমূহ এবং ইটালী ও ফ্রান্সের বন্দরসমূহ জয় করে নেয়। ২১২ হিজরীতে আগলাবীগণ যখন আব্বাসীয়গণের অধীনে থেকে উত্তর আফ্রিকা শাসন করছিলেন তখন কাযী আসাদ বিন ফুরাত তিউনিসীয় নৌবহরের সাহায্যে সিসিলীতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন, এরপর আরবরা ৪৬৪ হিজরী পর্যন্ত এই দ্বীপটি শাসন করে। এ সময়ে সিসিলী এবং উত্তর আফ্রিকার উপকূল অঞ্চল আরব নৌবহরের ক্রিয়াকাণ্ডের বড় বড় কেন্দ্র ছিল। আরবরা এই দুই-এর মধ্যবর্তী ভূভাগে খুবই ঘন ঘন যাতায়াত করত। এই দুই আফ্রিকীয় ও ইউরোপীয় উপকূল থেকে অগণিত জাহাজ রওনা হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া যেত। কিন্তু ভারত মহাসাগর, আবিসিনিয়া সাগর ও চীন সাগরে আরবরা ছিল নিতান্ত সওদাগর।

বসরা

আব্বাসীয় আমলে পুরানো বন্দর ওবুল্লার উল্লেখ পাওয়া গেলেও বাগদাদ থেকে ফোরাত হয়ে যেসব জাহাজ যেত সেগুলো শুধু বসরা-ই ধরে যেত, সে কারণে বসরা বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। বাগদাদ এবং ওয়াসিত থেকে আগত জাহাজ বসরা পৌঁছে ইবন ওমর খালের কিনারায় থামত। ওবুল্লা প্রধান বন্দরের মর্যাদায় উন্নীত হয় কেবলমাত্র চীন থেকে আগত জাহাজের জন্যে।[১] ইবন ওয়াদীহ্ ইয়াকুবীর মন্তব্য থেকে বসরার গুরুত্ব আরো বেশী অনুধাবন করা যাবেঃ "সারা দুনিয়ার জিনিসপত্র ও সওদাগরী মালের এটা ছিল প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও রাজধানী।"[২] ইবন আল-ফকিহ্ হামদানী (২৯০ হি.) তাঁর "কিতাবুল-বুলদান" এ লেখেন যে, বসরার লোকদের সওদাগরী ক্রিয়াকাণ্ড এ থেকেও বোঝা যাবে যে, তারা একদিকে তুর্কীস্তান ও ফারগনায় এবং অপরদিকে পশ্চিমের সস-এ যাতায়াত করত।[৩] উমাইয়া আমলে বসরার চতুর্দিকে যে অসংখ্য খাল খনন করা হয়েছিল তাদের সংখ্যা আব্বাসীয় আমলে নিশ্চয়ই আরো বেড়েছিল। ইসতাখারী (৩৪০) হি.) লিখেন যে, বসরাতে খালের সংখ্যা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ যা বলেন তা তিনি বিশ্বাস করেন না। কেননা

১. "কিতাবুল-বুলদান", ইয়াকুবী, পৃ, ৩৬০।
২. ঐ, পৃ, ৩২৩।
৩. ঐ, ইবনুল-ফিকিহ হামদানী, পৃ, ১৯১।

তিনি নিজে খুবই কাছে থেকে এমন সব খাল দেখেছেন যেগুলোতে ছোট নৌকা চলাচল করছিল।[১]

সিরাফ

৩য় হিজরী শতকে পারস্য উপসাগরের কূলে বসরা থেকে ৭ বিশ্রাম দূরে এই বন্দরটি স্থাপিত হয়। বন্দরটি বেশ গুরুত্ব লাভ করে। ভারত ও চীনগামী সকল আরব জাহাজ এখানে ভিড়ত।

এডেন

ইয়ামানের উপকূলে অবস্থিত এডেনে জনবসতি গড়ে উঠে অনেক পুরানো কালে। আব্বাসীয় আমলে সেই বসতি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ইয়াকুবী হিজরী ৩য় শতকের মাঝামাঝি সময়ে লেখেন: "এডেন সানার বন্দর। আবিসিনিয়া, মানদাহ্, জেদ্দা, সিলেট (আসাম)[২] ও চীন থেকে আগত জাহাজ এখানে নোঙর করে।" (পৃ. ৩১৯)

হিজরী ৪র্থ শতকের শেষে বাশ্শারী মুকাদ্দাসী এডেনের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধে এরূপ লেখেন: "কোন ব্যক্তি যদি এক হাজার দিরহাম নিয়ে এখানে আসেন তাহলে তিনি এক হাজার দীনার নিয়ে ফিরে যান এবং একশ' অবশ্যই পাঁচ শ' হয়ে যায়।"

সুহার

সুহার ছিল ওমানের বন্দর ও রাজধানী। বাশশারী লিখেন, "চীন সাগরের পাড়ে এর চেয়ে বড় কোন শহর নেই। অতি জনবহুল ও সুন্দর এই জায়গা। এখানে সম্পদ ও ফলমূল এন্তার। যুবাইদ্-সানা অপেক্ষা এই স্থান ভাল। সাগরের পাড় সমস্তটা জুড়ে আশ্চর্য সুন্দর বাজার। লোকের বাড়ীঘর সব উঁচু উঁচু এবং ইট ও শাল কাঠের তৈরী। এখানে একটি মিঠা পানির খাল আছে। এ হচ্ছে চীনের দরজা, প্রাচ্যের ধনভান্ডার এবং ইয়ামানের বাণিজ্য কেন্দ্র।"[৩]

শিহর

এখানে মাছের প্রাচুর্য ছিল। এখান থেকে মাছ রফতানী করা হত ওমান ও এডেনে, সেখান থেকে যেত বসরা এবং ইয়ামানের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে।[৪]

---

১. "ইসতাখারী", পৃ. ৮০ (লাইডেন সংস্করণ)।

২. "সিলাহাত" (سلاهط) নামে একটি শহরের নাম করা হয়েছে। সওদাগর সুলায়মানের কাছ থেকে আমরা জ্ঞাত হই যে, (পৃ. ৯) এ স্থান বঙ্গোপসাগরের নিকটে অবস্থিত। সম্ভবত এ স্থান সিলেট।

৩. লাইডেন সংস্করণ, পৃ. ৯২।

৪. লাইডেন, পৃ. ৮৭।

কায়স বা কাইশ

এই দ্বীপটি বাহরাইনের নিকটে ওমান সাগরে অবস্থিত ছিল। হিন্দুস্তান-গামী জাহাজ এখানে থামত।

বাহরাইন

এখানে সবসময়েই নাবিকদের বসবাস ছিল। হিজরী ৯ শতকে এখানকার উন্নতি এরূপ ছিল যে, সবসময় এখানে এক হাজার ছোট-বড় নৌকা ও জাহাজ থাকত।[১]

হুরমুয

এই দ্বীপটিও পারস্য উপসাগরে নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। কায়সের সঙ্গে এর প্রতিযোগিতা চলত। ভারত, চীন ও ইয়ামানের বাণিজ্য জাহাজ এখানে থামত।[২]

জেদ্দা

জেদ্দা ছিল মক্কার বন্দর। আবিসিনিয়া থেকে হিজাযে আগত জাহাজ এখানে নোঙর করত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে এই বন্দরটির ব্যবহার ছিল; কিন্তু আফ্রিকা, আবিসিনিয়া, সিন্ধু ও পারস্যে ইসলামের আবির্ভাব ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এটি অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করে।

জার

মদীনার বন্দর জার খলীফা মনসুর বন্ধ করে দেন। তারপর এ আর পূর্ব মর্যাদা ফিরে পায়নি। এর স্থান অধিকার করে কুলযুম।

কুলযুম

লোহিত সাগরের পাড়ে মিসরীয় উপকূলে সেনার নিকটে এই বন্দরটি অবস্থিত ছিল। এটি অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইয়াকুবী লেখেন, "সাগরের পাড়ে এটি বড় শহর। যে সব সওদাগর মিসর থেকে হিজায ও ইয়ামানে খাদ্যশস্য রফতানী করেন, তাঁরা এখানে থাকেন। এখানে জাহাজের জন্যে বন্দর আছে। বিভিন্ন দেশের ধন-সম্পদশালী সওদাগরগণ এখানে রয়েছেন।"

(পৃ. ৩৬০)

---

১ "কিতাবুল-ফাওয়াইদ ফি উসূলুল-বহর ওয়াল কাওয়াইদ", ইবন মাজিদ কৃত, পৃ. ৯ (প্যারিস সংস্করণ)।

২. "ইবন আসির", ৬১১ হিজরীর ঘটনাবলী।

আয়লাহ

বর্তমান নাম আকবাহ্। এটি ছিল কুলযুমের নিকটবর্তী সিরীয় বন্দর। ইয়াকুবীর মতে বিভিন্ন দেশের বহু সংখ্যক লোক এখানে বসবাস করত। মিসর, সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকার হজ্জযাত্রিগণ এখানে জমায়েত হতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর সওদাগরী সম্পদের লেনদেনের স্থানও ছিল এটি। (পৃ. ৩৬০)

প্রাচ্যের নৌপথসমূহ

আরব জাহাজ পারস্য উপসাগর থেকে ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে চীনে যেত। হিজরী ৩য় শতাব্দীর ভ্রাম্যমান সওদাগর সুলায়মানের লেখা থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় ঃ

হিন্দুস্তান, চীন ও সিংহলের মধ্যবর্তী সাগরে অজস্র বড় বড় মাছ রয়েছে। সেগুলো এত বড় যে, জাহাজের পক্ষেও বিপজ্জনক। রাত্রিবেলা জাহাজ চালানোর সময়ে ক্রমাগত ঘন্টা বাজাতে হয় যাতে মাছ দূরে চলে যায়। এই সাগরে আমরা একটা তিমি মাছ ধরেছিলাম বিশ হাত লম্বা। তৃতীয় সাগরের নাম হারাগন্দ (বহর-ই-হিন্দ, অর্থাৎ ভারত মহাসাগর)। এতে অগুণতি দ্বীপ রয়েছে। বলা হয় যে, ১৯০০ দ্বীপ রয়েছে এবং সেগুলো হারাগন্দ ও লারওয়াই-এর সীমা নির্দেশ করে। এই দ্বীপগুলোর শাসক একজন মহিলা। তিমির দেহজাত সুগন্ধি ও নারিকেল এখানে অজস্র পাওয়া যায়। এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপের দূরত্ব মাত্র সিকি মাইলের মত। সবগুলোতে লোক বসতি রয়েছে আর রয়েছে অসংখ্য নারিকেল গাছ। লেনদেন হয় কড়ি দিয়ে। রাণীর কোষাগারে কড়ি মজুদ করে রাখা হয়। এ এলাকার লোকজন খুব দক্ষ কারিগর। তারা হাতায় ও নীচে ঝুল দিয়ে কাপড় বোনে। এরা জাহাজ নির্মাণ, স্থাপত্য-শিল্প ও অন্যান্য কারুকার্যে খুব দক্ষ। হারাগন্দের শেষ দ্বীপের নাম শরনদ্বীপ (সিংহল)। জাজিরাকে এরা "দ্বীপ" বলে। শরনদ্বীপের উপকূলে এরা মুক্তা কুড়ায়। এখানকার পর্বতে হযরত আদম (আঃ)-এর পায়ের ছাপ রয়েছে। পাহাড়-পর্বতে চুণি, নীলা ও গোমেদ মণির খনি আছে। দ্বীপটি খুব বড়, এখানে দুজন রাজা আছেন। গাছের নির্যাস, সোনা এবং চুণিপাথর এখানে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এখানকার লোকেরা শংখ বাজায়, এই শংখ এখানকার সাগরে পাওয়া যায়।

এই সাগরে শরনদ্বীপ পর্যন্ত যে সকল জাহাজ চলাচল করে সেগুলো কয়েকটি বড় বড় দ্বীপ পার হয়ে যায়। একটি দ্বীপের নাম রামনি, এটিতে কয়েকজন রাজা আছেন। এটির দৈর্ঘ্য আট-নয়' শ ফার্লং। এখানে নানা

খনি রয়েছে। দ্বীপগুলোতে অত্যন্ত উন্নতমানের কর্পূর পাওয়া যায়। দ্বীপগুলোর অধিবাসিগণের প্রধান খাদ্য হচ্ছে নারিকেল। নারিকেল পেষা তেল ওরা খায়। বিয়ের কনেকে মোহর হিসেবে প্রদান করতে হয় শত্রুপক্ষের কোন একজনের মাথা। একজন পুরুষ যতজন খুশী মেয়েকে বিয়ে করতে পারে যদি প্রত্যেকের জন্যে একটি করে শত্রুর মাথা কেটে এনে দিতে পারে। দ্বীপগুলোতে হাতি পাওয়া যায়; আখও জন্মে। এখানকার অধিবাসীরা নরমাংস খায়। হারগিন্দ সাগর এবং সালাহাত (সিলেট ? বঙ্গোপসাগর) সাগরের মাঝখানে এই দ্বীপগুলো অবস্থিত। এগুলোর পরে আরো কতগুলো দ্বীপ পড়ে, সেগুলোর নাম লেন্দজে-বালুস। এখানকার নারী-পুরুষ সবাই ন্যাংটা থাকে। মেয়েরা গাছের পাতা দিয়ে শরীর ঢেকে রাখে। কোন জাহাজ এখানে এলে ওরা ছোট ছোট নৌকায় করে তিমি মাছের দেহ-নিসৃত সুগন্ধি ও নারিকেল নিয়ে আসে এবং লোহা, কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সংগে বিনিময় করে। এর পরে আরো দুটি দ্বীপ পড়ে, দুই দ্বীপের মাঝখানে আরেকটা সাগর আছে। একটি দ্বীপের নাম আন্দামান। এখানকার লোকেরা ঘোর কালো রঙের এবং তারা নরমাংস খায়। অন্যান্য দ্বীপও আছে, সেগুলো পার হওয়া অসম্ভব বিধায় তাদের নাম নাবিকদের জানা নেই।

(পৃ. ৩-১১, প্যারিস সংস্করণ)

মাসুদী[১] (৩০৩ হি.) নৌপথের আরো বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। পারস্য উপসাগর থেকে চীন সাগর পর্যন্ত আরব নাবিকেরা বিভিন্ন নদীর —অর্থাৎ সাগরের অংশের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রথমেই উল্লেখ করেছেন বহর-ই-ফারাস বা খাসবাত উল-বসরা নদীর। এর পরে উল্লেখ করেছেন লারওয়াই-এর, কূলে অবস্থিত ছিল কঙ্কণ ও গুজরাটের পুরানো উপ-কূলীয় শহর, ছেমার, সুবার, থানা ও খামবায়াত। এদের কোন-কোনটি আজো রয়েছে। এর পরে হারগিন্দ সাগর। তার পরে কালাহ্—এতে দ্বীপ ছিল, তার পরে সিনফ সাগর (চম্পা নদী) এবং সবশেষে চীন সাগর যেটিকে তারা বলত জিন্‌জি (চিনজি)।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, প্রথমোক্ত নদীটি হচ্ছে পারস্য উপসাগর। লারওয়াই-এর বর্তমান নাম আরব সাগর, হারগিন্দের বর্তমান নাম ভারত মহাসাগর। কালাহ্ সম্ভবত বঙ্গোপসাগর।

ভ্রাম্যমান সওদাগর সুলায়মান অন্যত্র এই একই পথের বর্ণনা প্রদান করেছেন এভাবে ঃ

১. "মুরুযুদ-দাহাব" প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩০-৩৪০ (প্যারিস সংস্করণ)।

চীনের অধিকাংশ জাহাজই সিরাফ-এ বোঝাই করা হয়। সিরাফ ও ওমান থেকে নৌকাতে করে মালপত্র আনা হয় এবং চীনগামী জাহাজে বোঝাই করা হয়। কারণ উপকূলের একেবারে কাছে পানি এত অগভীর যে, বড় জাহাজ তত কাছে আসতে পারে না। সিরাফ ও বসরার মাঝামাঝি জায়গায়; নৌ-কেন্দ্র থেকে এক শ' বিশ ফার্লং দূরে সিরাফ (?) থেকে জাহাজে মাল ও মিঠা পানি নিয়ে রওয়ানা হয় এবং সিরাফ থেকে ২০০ ফার্লং দূরবর্তী ওমানের বন্দর মস্কটে গিয়ে থামে। এর নিকটেই ওমানের সাগর ঘেরা পাহাড় রয়েছে, সে জায়গার নাম দোরদুরে। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এ এক সরু নৌপথ (বাবেল মন্ডব ?)। ছোট আকারের জাহাজ এখান দিয়ে চলাচল করে। চীনগামী বড় বড় জাহাজ এখানে আসতে পারে না। এখানে দুইটি বড় পর্বত আছে, একটির নাম কুসাইর এবং অপরটির নাম উরাইর। এই দুই পর্বতের গোড়া সাগর তলার মাটিতে আর মাথা পানির উপরে দেখা যায়। আরো সামনে এগুলে পড়ে ওমানের বন্দর সুহার। মস্কটের একটি কুয়া থেকে জাহাজে মিঠা পানি নেওয়া হয়।...জাহাজ আবার রওনা হয়ে হিন্দুস্তান এলাকার কোকামমালী (কোকান ?) পেঁছায়। হাওয়া ভাল থাকলে মস্কট থেকে কোকামমালী যেতে এক মাস লাগে। চীনা জাহাজ কোকামে আসে। তারা এক হাজার দিরহাম শুল্ক দেয়; অন্যান্য জাহাজ দেয় এক থেকে দশ দীনার। তারা এখানে মিঠা পানি নেয়। তারপর এখান থেকে হারগিন্দে (ভারত মহাসাগর) প্রবেশ করে এবং লেন্দজেবালুস নামক স্থানে পেঁছায়। এখানকার লোকেরা আরবী বোঝে না, সওদাগরেরা অন্য যে সব ভাষা বলে তা-ও বোঝে না। এরা উলঙ্গ থাকে, এদের গায়ের রঙ সাদা। এদের দাড়ি বা গোঁফ কিছুই নেই। এরা তক্তার তৈরী ছোট নৌকা করে নারিকেলের সাদা মিষ্টি রস, আখ ও কলা নিয়ে আসে ও সেগুলোর বদলে লোহা নেয়। ইশারায় লেনদেন হয়। এরা সাঁতারে খুব দক্ষ। অনেক সময় এরা কিছুই না দিয়ে সওদাগরদের কাছ থেকে লোহা কেড়ে নিয়ে চলে যায়। আরো সামান্য একটু সামনে কাল্লাহ বার। এই দেশ ও তীরভূমিকে তারা বলে 'বার'। এটা হল 'যাবায়' (জাভা) হিন্দুস্তানের দক্ষিণ দিকে একজন রাজা আছেন। তাঁর রাজ্যের লোকেরা শুধু লুঙ্গি পরে। সমাজের উঁচু-নিচু সবারই ওই এক পোশাক। এখান থেকে জাহাজে মিঠা পানি নেওয়া হয়। কোকাম থেকে কাল্লাহ বার পেঁছাতে এক মাস লাগে এবং আরো দশ দিন পরে বাতুমা পেঁছানো যায়, বাতুমাতে মিঠা পানি পাওয়া যায়। কাদার আরো

দশ দিনের পথ। সেখানেও মিঠা পানি আছে। সেখানে এক উঁচু পর্বত আছে, সেই পর্বতে চোর-ডাকাতরা লুকিয়ে থাকে। পরের দশ দিনে জাহাজ সিনফ (চম্পা) পেঁছায়। এখানেও মিঠা পানি মিলে। এখানে বৃক্ষ নির্যাস উৎপাদিত হয়। এখানে একজন রাজা আছেন। লোকেরা দুইটি লুঙ্গি পরে, একটি কোমরে বাঁধে এবং আরেকটি গায়ে জড়িয়ে রাখে। তারপরে সান্দের ফাওলাত (সিঙ্গাপুর)। সাগরবেষ্টিত এই দ্বীপটিতে পেঁছানো যায় দশ দিনে। এখানে মিঠা পানি আছে। এখান থেকে রওনা হয়ে জাহাজ জিনজিতে (চিনজি) থামে এবং চীনের দ্বারপ্রান্তের নিকটে নোঙর করে। এখানে সাগর-তলার কয়েকটি পাহাড় পানির উপরে মাথা তুলে আছে। জাহাজ জোড়া জোড়া পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পার হয় এবং সান্দের ফাওলাত থেকে রওনা হবার এক মাস পরে চীনে পেঁছায়। চীন প্রণালীতে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সাত দিন ধরে জাহাজ চালাতে হয়। তার পরে চীন উপসাগরে পেঁছে চীনের খানফুয়া (খানপুয়া) নামক শহরে নোঙর করে। (পৃ. ১৪-২১) খানফুয়া একটি বন্দর এবং আরব-বাণিজ্যের কেন্দ্র। এখানে সব ঘর কাঠের তৈরী, জাহাজ-ভাঙা কাঠ এখানে অজস্র পাওয়া যায়। জাহাজ এখানে অনেকদিন থাকে। মুসলমান-গণের বিচার-আচার করার জন্যে চীন সম্রাটের নিযুক্ত একজন মুসলিম কাযী আছেন।[১] ইরাকের সওদাগরেরাও তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে চলে।

(পৃ. ১৩-১৪)

উপরের ছত্রগুলোতে বসরা এবং সিরাফ থেকে ভারত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ পার হয়ে চীন পর্যন্ত পথ বর্ণনা করা হয়েছে। আরবরা শত শত বছর ধরে এই সব দ্বীপে তাদের নৌ-যোগাযোগ সম্পর্ক রক্ষা করে এবং শেষ পর্যন্ত স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে। তাদের দ্বারাই এসব এলাকায় ইসলাম প্রচারিত হয় এবং মালদ্বীপ থেকে জাভা, সুমাত্রা এবং সুমাত্রা থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত তাদের প্রভাব অনুভূত হয়। উপরের বর্ণনা-গুলো থেকে এই সব দ্বীপের আদি অধিবাসীদের বর্বর জীবন যাপনের পরিচয় পাওয়া যায়; আরব নাবিক ও সওদাগরেরা তাদের জীবন যাপনের অবস্থা পরিবর্তিত করে সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্তরে উত্তীরত করে। কয়েক শতাব্দী পরে এগুলোতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দ্বীপগুলো বিশেষ করে হাদ্রামাউত-আরবদের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এমনকি আজও এখানে বেশ কিছু সংখ্যক হাদ্রামাউত থেকে আগত লোক দেখা যায়।

১. "ইস্তাখারী" পৃ. ৩৫, (লাইডেন সংস্করণ)।

যে সকল ভারতীয় বন্দরে আরবদের যাতায়াত ছিল তাদের বিস্তারিত বিবরণ আমি আমার "আরব-ভারত সম্পর্ক" বই-এ দিয়েছি, এখানে আর কলেবর বৃদ্ধি না করে আমি শুধু নামগুলো উল্লেখ করব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আরবরা কাশবাতে আসত পারস্য উপসাগরের পারস্য উপকূল ধরে এবং তারপর তায়েয নামক বেলুচিস্তানের একটি বন্দরে প্রবেশ করত। তারপর তারা সিন্ধুর বন্দর থাথ-এ আসত, তারপর গুজরাট ও কাথিয়াবারের বন্দরসমূহে ভিড়ত, যথাঃ খানা, খামরায়াত, সানবারা, চেমুর, বাহরোচ, ভারভুত, গান্ধার, ঘোঘা, সুরাট; অতঃপর যেত মাদ্রাজ প্রদেশের বন্দরসমূহে, যথাঃ মালাবার, করোমন্ডল (মালাবার), কেপ কেমোরিন (কুমার) ত্রাভাংকুর (কুলুম) ম্যাঙ্গালোর, চালইয়াট, পিন্ডারানী, চান্দাপুর, হানুর, দেফাতান, কালিকট ও মাদ্রাজ এবং তারপরে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করত। এখানে তাদের কেন্দ্র ছিল সিলেট—একে তারা বলত সিলাহাত। তারপর তারা যেত চট্টগ্রাম, একে বলত সাদজাম। এখান থেকে শ্যাম হয়ে চীন সাগরে প্রবেশ করত।

তাদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল গুজরাট ও সিন্ধু। শুনতে অবাক লাগতে পারে যে, মাসুদী যখন ভারতে আসেন তখন গুজরাটের বন্দর চেমুরে দশ হাজার আরব অধিবাসী ও তাদের বংশধরেরা ছিল। খামবায়াতেও তারা বসবাস করত। বাহরোচ থেকে তারা লাক্ষা ও নীল নিত।[১] মাদ্রাজে তৈরী তোষক তারা মিসরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত।[২]

আফ্রিকা উপকূল

আরবদের অপর সমুদ্র-পথ ছিল এটি। তারা লোহিত সাগরে আসত, সেখান থেকে আফ্রিকার আবিসিনিয়া উপকূলে যেত এবং আবিসিনিয়ার সাফালা (মুজাম্বিক) ও যীলাতে যেত। এই যীলা ছিল আবিসিনিয়ার বন্দর, যীলা থেকে তারা হিজায ও ইয়ামানে যেত।[৩]

আরবরা আফ্রিকা ধরে ঘোরাপথে জাঞ্জিবার গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দরসমূহে প্রবেশ করত। আফ্রিকার উপকূলভাগ ধরে তারা সোনার খনির জন্যে বিখ্যাত যে অঞ্চল সেখানে যেত। কানবু দ্বীপে—বর্তমান নাম মাদাগাস্কার পেঁাছে তারা যাত্রা সমাপ্ত করত। মাসুদী (৩০৩ হি.) তাঁর মুরুয্যুদ-দাহাব বই-এ এই নৌপথের বর্ণনা দিয়েছেন। এই উপকূল এখন নাটাল, ট্রান্সভাল ইত্যাদি নামে পরিচিত।

---

১. "মুজামুল-বুলদান", ইয়াকুবী।
২. "কিতাবুল-আইতাবার", আবদুল লতীফ বাগদাদী, এবং আমার লেখা বই "আরব-ভারত সম্পর্ক"।
৩. "ইসতাখারী", পৃ. ৩৬।

সিরাফ এবং ওমান থেকে জাহাজ এখানে আসত। নাবিকেরা ছিল প্রধানত আযদ্ গোত্রীয়। ওমান ও সিরাফ থেকে আবিসিনিয়া, যীলা, আইধাব, সাওয়াকিন, জাঞ্জিবার ও বারবারা হয়ে তারা মাদাগাস্কার পর্যন্ত যেত এবং আবার একই পথ ধরে ফিরে আসত। আবিসিনিয়ার উপকূল থেকে তারা তিমি মাছের দেহ-নিসৃত সুগন্ধি এবং বারবারা থেকে সোনা কিনত। হিঃ ৪র্থ শতকের শুরুতে মাদাগাস্কারে একটি আরব বসতি ছিল। এই উপকূলেই ১০ম হিজরী শতকে পর্তুগীজ নাবিকেরা এবং ভাস্কো ডা-গামা আরব নাবিকগণের দেখা পেয়েছিলেন যাঁরা তাঁদেরকে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান বলে দিয়েছিলেন।

এইসব উপকূলে ওমানের আরবদের এমনি প্রভাব ছিল যে, এগুলো ওমান রাজ্যের অংশ হয়ে গিয়েছিল। জাঞ্জিবার দীর্ঘকাল যাবত ওমানের সুলতানের অধীনে ছিল, পরে ইউরোপীয়রা তা অধিকার করে নেয়।

ভূমধ্যসাগর

ভূমধ্যসাগরের সিরীয় উপকূল থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত অব্বাসীয়গণের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। তাঁদের মনে সব সময়ই রোমীয় অভিযানের আশংকা ছিল, তাই তাঁরা সিরিয়ার উপকূলস্থ সুর-এ উমাইয়াদের প্রতিষ্ঠিত জাহাজ নির্মাণ কারখানাটি চালু রাখেন, কিন্তু মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ ২৪৭ হিজরীতে কারখানাটি আক্কাতে স্থানান্তরিত করেন এবং এ উপকূলভাগ রক্ষার জন্যে নতুন নৌ-বাহিনী গড়ে তোলেন।[১]

বাশ্শারী মুকাদ্দাসী লেখেন:

আক্কা প্রথম দিকে সুর-এর মত এমন সুরক্ষিত ছিল না, কিন্তু ইবন তুলুন (আহমদ ইবন তুলুন) এখানে এসে এর রক্ষার ব্যবস্থা সুর-এর মত সুদৃঢ় করার সংকল্প করেন। সুর-এর নৌ-রক্ষা ব্যবস্থা দেখে তিনি খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কোন স্থপতিই পানিতে নির্মাণ কাজ করতে পারলেন না। অবশেষে (বাশ্শারীর) দাদা আবু বকরকে জেরুজালেম থেকে আনার জন্যে লোক পাঠানো হয়। তিনি এসে কাঠের গুঁড়ির উপর পাথর বসিয়ে একটির সঙ্গে আরেকটি বেঁধে তারপর বন্দর নির্মাণ করেন। মাঝখানে তিনি একটি বড় ফটক নির্মাণ করেন এবং তার সঙ্গে লম্বা শিকল বেঁধে দেন। রাতে বন্দরে কোন জাহাজ এলে এই শিকল টেনে তারা আগমন বার্তা জানাত।[২]

মুতাওয়াক্কিল-এর উত্তরাধিকারী মু'তাজ-এর আমলে ইবন তুলুন মিসরের শাসক নিযুক্ত হন। তিনি ২৪৫ হিজরী থেকে ২৭০ হিজরী পর্যন্ত মিসর শাসন করেন, কাজেই উপরিউক্ত নির্মাণ কাজ সে সময়েই হয়ে থাকবে।

---

১. "বালাযুরী", পৃ. ১১৮, (লাইডেন সংস্করণ)।

২. "আহসানুত তাকাসিম", বাশ্শারী, পৃ. ১৬২-৬৩।

পাঁচ

ভূমধ্যসাগরে ফাতেমিগণ

ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য লাভের জন্যে আরব ও রোমীয়গণ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, কিন্তু আরবদের নৌ-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে রোমীয়রা পশ্চাদ-পসরণ করতে বাধ্য হয়। ২৯৬ হিজরীতে উত্তর আফ্রিকায় উবাইদ ফাতেমিগণের শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে ক্রমে এ'রা সিসিলী, মিসর ও সিরিয়াতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। এই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে সমুদ্রপথে অগ্রগতি একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, কারণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ যুক্ত ছিল নৌ-পথে। কাজেই তিউনিসের পুরানো জাহাজ নির্মাণ কারখানাটির প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়। এই কারখানায় সব সময়েই যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত অবস্থায় থাকত।

৩০৩ হিজরীতে ভূমধ্যসাগরের কিনারায় একটি পাহাড় খুঁড়ে এক বড় জাহাজ ঘাঁটি তৈরী করা হয় যাতে সেখানে দুই শ' যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন রাখা যায়। এই জাহাজ ঘাঁটির নাম ছিল "শীনি" এবং এর একেকটা এত বড় ছিল যে, চালানোর জন্যে ১৪৩টি দাঁড় টানতে হত। এতে একটি ফটক বা বড় দরজা ছিল, সেটি বন্ধ করার তালাও ছিল। প্রত্যেকটিতে আলাদা গোলাঘর ছিল এবং মিঠা পানি মজুদ রাখার আলাদা ব্যবস্থা ছিল।

সিসিলী

সিসিলীতে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ও নৌ-বাহিনীর বন্দর ছিল মেসিনাতে। এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে সওদাগরেরা আসত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন করত। সিসিলীর আরব সরকার প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধের নৌবহর নির্মাণের জন্যে জাহাজ-কারখানাটি এখানে অবস্থিত ছিল।[১] পালার্মোতে ছিল আরেকটি বিশাল বন্দর ও জাহাজ কারখানা। এই পালার্মো ছিল একটি উপকূলবর্তী শহর এবং সিসিলীর রাজধানী। লোহা ও কাঠ সরবরাহ হত স্থানীয় খনি ও বন থেকে। হাজার হাজার শ্রমিক জাহাজ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিল।[২]

---

১. "নুযহাতুল-মুশতাক," ইদ্রিসী, পৃ. ২৬।
২. "ইবন হাইকাল," পৃ. ৮২।

স্পেনের বন্দরসমূহ

আরবদের কালে দুটি বিখ্যাত বন্দর ছিল আলমেরিয়া (মারিয়া) ও পেচিনা (বিজ্জানা), স্পেনীয়রা এ দুটিকে বলত প্রাচ্যের দরজা। ইয়াকুত তাঁর "মুজামুল-বুলদান" গ্রন্থে মারিয়া সম্বন্ধে লেখেন ঃ

> মারিয়া (আলমেরিয়া) স্পেনের ভেরা জেলায় অবস্থিত একটি বড় বন্দর। সওদাগরেরা এখান থেকে সমুদ্রযাত্রা করেন, সওদাগরী জাহাজ এখানে নোঙর করে। জাহাজ এবং নৌকা মেরামত করার জন্যে এখানে একটি মেরামত কারখানা আছে। সাগরের ঢেউ নগর দুর্গের দেয়ালে এসে আছড়ে পড়ে। এখানে খুবই উন্নতমানের রেশম ও ব্রোকেড কাপড় তৈরী হয়। এই শিল্প-কারখানা আগে কর্দোভায় ছিল, কিন্তু মারিয়া (আলমেরিয়া) কর্দোভাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ৫৪২ হিজরীতে ইউরোপীয়রা নৌ ও স্থলপথে আক্রমণ করে এটি দখল করে নিয়েছিল, কিন্তু ৫৫২ হিজরীতে মুসলমানরা এটি পুনর্দখল করে। ইউরোপীয়দের মোকাবিলা করার জন্যে মুসলিম যুদ্ধ জাহাজগুলো এখানে সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। মারিয়া বেল্লিশ (ভেলেয মালাগা) স্পেনের অপর একটি বন্দর, যাত্রীরা সেখান বারবার-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

উত্তর আফ্রিকা এবং মরক্কোর সবচেয়ে বিখ্যাত বন্দর ছিল পেচিনা (বিজ-জানা), এটি ভূমধ্যসাগরের আফ্রিকা উপকূলে আলজিরিয়া ও মরক্কোর মাঝপথে অবস্থিত ছিল। প্রথমে এটি একটি সাধারণ বন্দর ছিল। ৪৫৭ হিজরীতে নাসির ইবন আল-নাস সুবিধাজনক স্থান বিবেচনা করে এটির প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে পরিণত হয়। এখান থেকে বিভিন্ন দেশ অভিমুখে জাহাজ ছাড়ত, সকল জায়গা থেকে যাত্রীরাও আসত।

মরক্কোর আরেকটি বিখ্যাত বন্দর ছিল সাবতা (সিউটা), স্পেনের উল্টোদিকে আফ্রিকার উপকূলে এটি অবস্থিত ছিল। ইয়াকুতের মতে এটি ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর।.

আফ্রিকার সবচেয়ে বিখ্যাত বন্দর ছিল মাহ্দিয়া, ৩০০-৩০৫ হিজরীতে ফাতেমী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এটি নির্মাণ করেন। আস্ত পাথর কেটে এখানে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা তৈরী করা হয়েছিল। সেই কারখানা ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত এবং এক সঙ্গে তিরিশটি জাহাজ সেখানে ভিড়তে পারত। বন্দরের দুই দিকেই বিশাল শিকল টানা দেওয়া থাকত, জাহাজ এলে সেই সিকল খুলে দেওয়া হত।

আবু উবায়েদ বাকরী (ওফাত ৪৮৭ হি., ১০৯৪ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর "মাসালিক ওয়া মামালিক" গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত বন্দরগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন এবং কোন-কোনটির বর্ণনাও করেছেন :

মারসা'ল উন্দলুসীন, তাইনি, সানিয়া, খাররাতাইন, আল-খাযার, দার, দাঙ্গায, যাবন, মাদফুন, রাহিব, রুম, যয়তুনা, সাবিবা, শাজরা, আমারাহ, কিবতা, মারিফান, মাসাইন, মুগিলা, মালাভি, মানীয়া মুসা, জাবাল, দুহরান।[১]

ভূমধ্যসাগরের পথে মুসলমানদের ঘন ঘন চলাচলের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল হজ্জ। প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে স্পেন এবং মরক্কো থেকে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান আলেকজান্দ্রিয়াতে আসতেন। বিখ্যাত স্পেনীয় ভ্রমণকারী ইবন জুবায়ের ৫৭৮ হিজরীতে স্পেন থেকে জেনেভার একটি জাহাজে করে আলেকজান্দ্রিয়া এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণের পর্যায় সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন :

তিনি ৫৭৮ হিজরীর ২৮শে শাওয়াল তারিখে সাবতা (সিউটা) থেকে একটি জাহাজে উঠেন এবং ইভিজা, মেজর্কা, মাইনর্কা সারডিনিয়া, সিসিলী ও ক্রীট দ্বীপ অতিক্রম করে সেই বছরেরই ২৯শে জিলকদ তারিখে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছান। এই ভ্রমণে সময় লেগেছিল মোট ২৯ দিন।[২]

বারকাতে তুলমিয়া নামে একটি বন্দর ছিল। সেখানে সময়ে সময়ে জাহাজ থামত।[৩] কায়রোয়ানে ভূমধ্যসাগরের উপকূলের একেবারে প্রান্তে অবস্থিত ছিল আবি শারীক। সেখানে উমর (রাঃ)-এর বংশধরগণের এবং অন্যান্য আরব ও ইরানী অধিবাসীদের বসতি ছিল। এর নিকটেই আম-লিবিয়া নামক একটি বন্দর ছিল, সেখান থেকে যাত্রীরা সিসিলী যেত।

মিসরের বন্দরসমূহ

হিজরী ৩য় শতকের শেষভাগে তিউনিস সাগরে বড় বড় জাহাজ চলাচল করত। সে সময়ে একটি সমৃদ্ধিশালী বসতি ছিল রশীদ। এখানে বন্দর ছিল, এখান দিয়ে নীলনদ বয়ে গিয়ে ভূমধ্যসাগরে পড়ত, এবং ভূমধ্যসাগর থেকে জাহাজ এই বন্দর হয়ে নীলনদে প্রবেশ করত।

মামলুকগণের আমলে মিসরের একটি বড় উপকূলীয় শহর ছিল কাউস। দক্ষিণাঞ্চল থেকে জাহাজযোগে আগত সওদাগরেরা এখানে থামত। এডেনের

১. "মাসালিক ওয়া মামালিক" (আলজেকিরাস সংস্করণ), ১৯১১।
২. "ইনট্রোডাকশন টু ট্রাভেলস অব ইবন জুবায়ের" (গিব), পৃ. ৩৫-৩৮।

সওদাগরেরাও এখানে থাকত। নৌ-বাণিজ্যের সুফল বওয়া অ-মাপা ধন-সম্পদ ছিল এখানে।[১]

ফারামার কাছে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে কাসতিয়া নামক একটি প্রাচীন বসতি রয়েছে। এরও দামীয়াত নামে একটি বন্দর ছিল এবং সেটি নীল-নদ ও ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটি ছিল খুবই বড় বন্দর এবং জাহাজের ভীড় এখানে লেগেই থাকত। এখানে দুটি বড় উঁচু স্তম্ভ (মিনার) ছিল, এই স্তম্ভের মাঝখানে মোটা লোহার শিকল টানা থাকত। বিনা অনুমতিতে কোন জাহাজ কিনারায় ভিড়তে গেলে শিকলে বাধা পেত।[২]

ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধজাহাজ

আরব নৌ-চলাচলএবং যুদ্ধ জাহাজসমূহের সবচেয়ে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন ইবন খালদুন। তিনি লিখেছেন :

> আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে এবং শক্তিশালী হয়ে উঠলে বিভিন্ন পেশার লোক তাদের অধীনে চাকরী করতে আসে। তারা খালাসী-সুখানী ও নাবিকদের নিযুক্ত করে, এরা তাঁদের নৌ-অভিযানের জ্ঞান ও কার্যাবলী বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তখন আরবদের মধ্য থেকেই নৌ-চালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি তৈরী হয় এবং তখন তাদের নৌ-জিহাদের আগ্রহ ও আকাংক্ষা জেগে উঠে। সওদাগরী ও যুদ্ধ এই উভয় উদ্দেশ্যেই তারা জাহাজ নির্মাণ করতে থাকে এবং যুদ্ধ জাহাজগুলোকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করে তোলে। ভূমধ্যসাগরে অপর পাড়ে, আফ্রিকার উপকূলভাগে যুদ্ধ করার জন্যে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। যেসব স্থান যুদ্ধের জন্যে নির্বাচিত হয় সেগুলো সিরিয়া, আফ্রিকা, মরক্কো ও স্পেনের উপকূলে অবস্থিত ছিল। খলীফা আবদুল মালিক আফ্রিকার শাসনকর্তা হাসান ইবন নুমানকে তিউনিসে নৌ-যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় একটি অস্ত্র কারখানা গড়ে তোলার আদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীকালে যিয়াদত উল্লাহ ইবন ইব্রাহীম ইবন আগলাবের আমলে এখান থেকে সিসিলী অভিমুখে একটি নৌ-অভিযান পরিচালিত হয় এবং দ্বীপটি এরা দখল করে নেয়। কাওসারাও অধিকৃত হয়।...

এরপর আফ্রিকা ও স্পেনের যুদ্ধ-জাহাজগুলো একে একে বিপরীত কূলের ওবায়দীয়া ও উমাইয়া রাজ্যগুলো দখল করে নেয়। আবদুর রহমান ইবন নাসিরের আমলে স্পেনীয় যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা ছিল

১. "মুজামুল-বুলদান", ইয়াকুত কৃত, কাউস দ্রষ্টব্য।
২. "আল-আনিসুল-মুফিদ", পৃ. ১০০-১০১।

দুই শ'। আফ্রিকার নৌবহরেও প্রায় সম-পরিমাণ যুদ্ধ জাহাজ ছিল। আমীরুল-বহরের নাম ছিল ইবন রামাহাস। এই জাহাজগুলোর কেন্দ্রীয় বন্দর ছিল বিজজানা ও মারিয়া। প্রত্যেক বন্দরেই সব জাহাজ একজন প্রধান কর্মকর্তার অধীনে নোঙরাবদ্ধ থাকত। তিনি জাহাজ, নাবিক ও নৌ-সেনাদের তত্ত্বাবধান করতেন। প্রত্যেক জাহাজে একজন কাপ্তান থাকতেন, তিনি হাওয়ার আকর্ষণহেতু জাহাজের গতি, দাঁড়ের টান হেতু পালের অবস্থান্তর এবং নোঙর করার কাজ তদারক করতেন। যুদ্ধ বাধলে সবগুলো যুদ্ধ-জাহাজই একটি বিশেষ বন্দরে একত্রিত করা হত এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে একজন আমীরের অধীনে পাঠানো হত।

গৌরবময় যুগে ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল, তাদের শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় খৃস্টান নৌবহরের আধিপত্য সামান্যই ছিল। ফলে সবখানে মুসলমানদের নৌ-বিজয় সূচিত হয় এবং তারা প্রায় সবগুলো দ্বীপেরই প্রভুত্ব অর্জন করে। যথা, মেজর্কা, মাইনর্কা, আইভিজা, সার্ডিনিয়া, সিসিলী, কাওসারা, মাল্টা, ক্রীট, সাইপ্রাস এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভূখণ্ড।

আবুল কাসিম (একজন শিয়া) ও তাঁর ছেলেরা প্রায়ই মাহদীয়া থেকে গিয়ে জেনেভার উপকূলীয় শহরগুলোতে আক্রমণ পরিচালনা করতেন এবং সাফল্যের সঙ্গে ফিরে আসতেন। দানীয়ার প্রধান আমীর তাঁর নৌ-বহর নিয়ে ৪০৫ হিজরীতে সার্ডিনিয়া দখল করেন, কিন্তু পরে খৃস্টানরা সেটা পুনর্দখল করে। মুসলমানরা ছিল এই সাগরের বাদশাহ, তাদের জাহাজ এখানে নিয়মিত চলাচল করত। মুসলিম সেনাদল সিসিলী থেকে এই সাগর দিয়ে মহাদেশের উত্তরাঞ্চলে যেত এবং ইউরোপীয় রাজা-গণের রাজ্য আক্রমণ করত। সিসিলীর সাবেক শাসক বনী হাসানদের আমলেও তারা তাই করত। এ সময়ে সব খৃস্টান শক্তি তাদের নৌবহর সাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকে সরিয়ে নেয়।......মুসলিম নৌবহর এমনভাবে তাদের উপর গিয়ে হামলা করত ঠিক যেমন সিংহ তার শিকারের উপর লাফ দিয়ে পড়ে। সমগ্র ভূমধ্যসাগর এলাকা মুসলিম জাহাজে পূর্ণ ছিল, যুদ্ধ বা শান্তি সব সময়ে সেগুলো সাগরময় চলাচল করত। একটি খৃস্টান নৌকাও এই সাগরে ছিল না। উবায়দী শক্তির অবনতি শুরু হলে তখন খৃস্টান শক্তি ক্রমেই সবল হয়ে উঠে এবং মিসর ও সিরিয়ার উপকূলে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। তখন আর মুসলিম নৌবহর ছিল না।

কিন্তু সুলতান সালাহ্উদ্দীন উবায়দী শক্তি উৎখাত করে মিসর ও সিরিয়াকে খৃস্টান অধিবাসী মুক্ত করে নৌ-বাহিনীর উন্নয়ন সাধন করেন।

ইমাদ আল-কাতিব তাঁর "আল-ফাতাহ্‌ল-কিস্‌সি" বইয়ে লিখেছেন, কেমন করে সালাহ্‌উদ্দীন সিরীয় উপকূলের প্রতিদ্বন্দ্বী নৌবহরের মুকাবিলা করেছিলেন। তাঁর লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

> আলেকজান্দ্রিয়ার কর্মকর্তাগণকে বড় বড় জাহাজে করে খাদ্যদ্রব্য পাঠানোর জন্যে এবং জাহাজে সাহসী তীরন্দাজ মোতায়েন করার জন্যে আদেশ পাঠানো হয়। তারা সিরীয় উপকূলের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র খৃস্টানরা চারদিকে থেকে ঘিরে আটক করার চেষ্টা করে, কিন্তু মুসলিম জাহাজগুলো বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তীরে পৌঁছায়। (পৃ. ২৮৪)

ইবন খালদুন লিখেন:

> উমাইয়াদ বংশের পতনের পরে সে এলাকায় ইসলামী নৌবহরও গুরুত্ব হারায়। কিন্তু আফ্রিকা ও মরক্কোতে নৌবহর তেমনি শক্তিমত্তার সঙ্গে রক্ষা করা হয়; সেখানে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেই আরব নৌবহরের নেতা ছিলেন বনী মায়মুন গোত্রীয়গণ, যাঁরা লানাতোনার কাল পর্যন্ত কাদাম দ্বীপের প্রধান ছিলেন। অতঃপর তাঁদের কাছ থেকে নেতৃত্ব লাভ করেন শাসক মুয়াহিদ আবদুল মুমিন। স্পেনীয় ও আফ্রিকা উপকূলে মুয়াহিদগণের যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা ছিল একশ'। হিজরী ৭ষ্ঠ শতকে মুয়াহিদ সাম্রাজ্য যখন গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়ায় এবং স্পেন ও মরক্কো উভয় দেশেই তাদের কর্তৃত্ব স্বীকৃত তখন তারা যুদ্ধ জাহাজের এমন উন্নতি বিধান করে যে, সেগুলো হয় তুলনাহীন। নৌবহরের প্রধান কর্তা ছিলেন আহ্‌মদ। তিনি ছিলেন সিসিলী দ্বীপের অধিবাসী।

হিজরী ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইসতাখারীর আবির্ভাব। তিনি স্পেন ও সিসিলী সফর করেন। তিনি লিখেন:

> ভূমধ্যসাগরের চেয়ে সুন্দর আর কোন সাগর নেই। এর দুই পাড়েই সারিবাঁধা জনবহুল বাসভূমি।......
>
> রোমক ও মুসলিম জাহাজ এই সাগরের কিনারা থেকে কিনারায় চলে। মুসলিমদের সঙ্গে রোমীয়দের মুখোমুখি সাক্ষাত হয়—একশ' বা তারও বেশী জাহাজ—প্রত্যেকেই নিজ নিজ পক্ষে সারিবদ্ধ হয় এবং সাগরে শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ। (পৃ. ৭১)

এটা তাহলে বলাই বাহুল্য যে, আরবরা উভয় অঞ্চলেই চলাচল করত। স্পেন ও তান্‌জা হয়ে তারা পশ্চিম এবং দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত যেত এবং আরেক দিকে এশিয়া মাইনর, কনস্টান্টিনোপল এবং কিছু সংখ্যক দ্বীপ পার হয়ে সিসিলী, ইটালী ও ফ্রান্সে যেত। আজকের দিনে কথাটা

হয়ত বিস্ময়কর শোনাবে যে, জিব্রাল্টারের মূল নাম যেমন জাবালুত তারিক ঠিক তেমনি বিখ্যাত ফরাসী বন্দর মার্সাই-এরও মূল নাম মার্সাই আলী مرساء على যার অর্থ হচ্ছে আলীর বন্দর। ইদ্রিসীর ভূগোল গ্রন্থে এই নাম পাওয়া যায়।

বর্তমান ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা করা অসম্ভব। কিন্তু এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরেও কোন সৎ ঐতিহাসিক কি "এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম"-এ মার্টিন হার্টমান কর্তৃক "চীন শীর্ষক" প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেন ?

> ইসলাম বরাবরই সমুদ্রকে ভয় পেয়েছে। প্রথম থেকেই ইসলাম মহাসাগরে অবিশ্বাসীদের আধিপত্য সম্বন্ধে সচেতনতার ভাব পোষণ করত। অবিশ্বাসীদের শ্রেষ্ঠত্ব মোকাবিলা করার কোন চেষ্টাও তারা করেনি। যখনি মুসলমানরা কোন নৌ অভিযান করেছে, তখনি তা দারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সমুদ্রপথে বাইযেনটিয়ামের উপর তারা যতবার আক্রমণ করেছে ততবারই ব্যর্থ হয়েছে। (পৃ: ৮৪৪)

ছয়

সাগরতত্ত্ব

সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শুরুতে বিভিন্ন জাতির মানুষ যখন সমুদ্র পথে চলাচল করত তখন তাদের ধারণা ছিল যে, প্রত্যেকটি সাগর আলাদা আলাদা এবং ভিন্ন।[1] কিন্তু আধুনিক দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হচ্ছে এই যে, সব সাগর একত্রে মিশে এক অভিন্ন জলরাশি গঠন করেছে। ভারত, চীন, পারস্য, রোম ও সিরিয়ার যে সাগর সেগুলো বিচ্ছিন্ন নয়; বরং একই বিপুল, বিশাল পানির চক্র, সেইচক্র এই দেশগুলোকে ঘিরে রয়েছে।

আরবরা এই সত্যটি জানত না, কিন্তু ২২৫ হিজরীতে সুলায়মান নামক জনৈক আরব নাবিক লিখে গেছেন যে, তাঁর সমসাময়িক আমলের আগে কেউ এটা জানত না। তিনি লিখেছেন ঃ

> যেসব কথা লোকে আগে জানত না এবং আমাদের আমলে জানতে পেরেছে, সেগুলো হচ্ছেঃ চীন সাগর এবং ভারত মহাসাগর সিরীয় সাগরের সঙ্গে যুক্ত। আগের দিনের নাবিকদের এরকম কোন ধারণাও ছিল না, কিন্তু আমাদের আমলে এটা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা এরূপ খবর পেয়েছি যে, ভূমধ্যসাগরে যে জাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছে এবং ঢেউয়ের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সেগুলো হাওয়ার টানে পানিতে ভেসে খাযার সাগরে চলে এসেছে এবং সেখান থেকে ভূমধ্যসাগরে এসেছে (بحر الروم) এবং তার পরে ভূমধ্যসাগর ও সিরীয় সাগরে এসেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, চীন ও সীলার (سيلا) চতুর্দিকে সাগর রয়েছে, তা তুর্কীস্তান ও খাযারের পিছনে বিস্তৃত হয়েছে। তারপর ভূমধ্য উপসাগরে গিয়ে পড়ে সিরিয়ার উপকূলে প্রবাহিত হয়েছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে কারণ প্রধানত জাহাজের কাঠ জোড়া বাঁধা থাকত আর শুধুমাত্র রোমীয় জাহাজে লোহার কাঁটা লাগানো থাকত। আরো একটি কারণ দৃষ্টে আমরা এই সত্য জানতে পেরেছি, সেটি হচ্ছে, ভূমধ্যসাগরে আম্বর পাওয়া গেছে, অথচ এখানের আম্বর পাওয়া যেত বলে পূর্বে কখনো জানা যায়নি। এটা যদি সত্য

---

১. "মুরুযুদ-দাহাব," প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৭২ (প্যারিস সংস্করণ এবং আহসানুত-তাকাসিম, বাশ্‌শারী কৃত, পৃ. ১৬-১৭।

হয় তাহলে আম্বর এখানে সম্ভবত এডেন থেকে এসে থাকবে। আম্বর যে সকল নদীতে জন্মায় তাদের সঙ্গে লোহিত সাগরের সংযোগ থাকলেও লোহিত ও ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে প্রতিবন্ধক রয়েছে (এই প্রতিবন্ধক হচ্ছে সুয়েজ, যা এখন খাল)। কাজেই আম্বরের কথা যদি সত্য হয় তাহলে খুব সম্ভবত ভারত মহাসাগর আম্বর অন্যান্য সাগরে বহন করে নিয়েছে, সেই সব সাগর থেকে শেষ পর্যন্ত তা ভূমধ্যসাগরে গিয়ে থাকবে।

সুলাইমানের উল্লেখিত প্রথম পথটি ভারত মহাসাগর থেকে চীন সাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও বেরিং সাগর হয়ে উত্তর মহাসাগর এবং তারপর আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে জিব্রাল্টার অতিক্রম করে ঘুরে এসে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় যে পথটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন—যে ভারত মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগরের আম্বর বাহিত হত—সেটি ছিল সহজতর পথ এবং অধিক উন্মুক্ত। এই পথ ভারত মহাসাগর থেকে বারবারা সাগরের মধ্য দিয়ে আটলান্টিক সাগর (بحر محيط) পর্যন্ত এবং আটলান্টিক মহাসাগর থেকে জিব্রাল্টারের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ছিল। সুলায়মান এই পথের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে মনে হয় যে, পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগের মানচিত্র সম্বন্ধে তাঁর পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল। পরবর্তীকালে নাবিকগণ আরো বেশী পরিষ্কারভাবে আফ্রিকার উপকূল থেকে থেকে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের পথ বর্ণনা করে গেছেন।

ইবনে ওয়াদিহ ইয়াকুবী সুলায়মানের পঞ্চাশ বছর পরে আবির্ভূত হন। তিনি তাঁর ভূগোল বই "কিতাবুল বুলদানের" শেষে মরক্কোর একটি উপকূলীয় শহর সস্-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, সাগরের কিনারায় বাহলোল নামে একটি মসজিদ ছিল এবং "সেই মসজিদের সামনে ওই সব দড়িবাঁধা জাহাজ এসে ভিড়ে। এই জাহাজ পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় নির্মিত হয় এবং পারস্য উপসাগর দিয়ে সেগুলো চীনে পাড়ি দেয়।"

মাসুদী (৩০৩ হি.) এবং আবু রায়হান বেরুনী (ওফাত ৪৪০ হি.) সাগরের সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। ইয়াকুতের মতে তাঁদের বর্ণনা ঃ

জন অধ্যুষিত দুনিয়ার পশ্চিমের এবং তানজা ও স্পেনের উপকুলের যে সাগর, তার নাম بحر محيط (আটলান্টিক মহাসাগর), গ্রীকরা একে বলে اوقيانوس। এই সাগরের মাঝখানে যাওয়া সম্ভব নয়। জাহাজ এর

কিনারা দিয়ে চলাচল করে। এইসব দেশ থেকে সাগর উত্তরে সাকালিবার (স্লাভোনিক) দিকে প্রসারিত। সাকালিবার উত্তরে একটি উপসাগর রয়েছে, সেটি বালগার নামক একটি মুসলিম দেশ পর্যন্ত গিয়েছে। এর নাম বেরিং নদী। এর উপকূলে বেরিং গোত্রীয় লোকেরা বাস করে। এখান থেকে সাগর পূর্বদিকে গেছে। সাগরের উপকূল ও দূরের তুরস্কের এলাকার মাঝখানে জনশূন্য এলাকা ও দুর্গম পর্বতসমূহ রয়েছে। তাঞ্জা থেকে সাগর দক্ষিণমুখী হয়ে পশ্চিম সুদানের (আফ্রিকা) কামার নামক পর্বতমালায় পেঁৗছেছে। এই পর্বত থেকে মিসরের নীল নদের উৎপত্তি। পানি এখানে যথেষ্ট কিন্তু জাহাজ নিরাপদে চলতে পারে না। সাগর এখান থেকে ঘুরে পূর্বদিকে চীনের শেষ সীমা পর্যন্ত গেছে। এই পথও নৌ-চলাচলের উপযোগী নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে দেশের কিনারা দিয়ে সাগর গেছে নামকরণ হয়েছে সেই দেশেরই নামে চীন সাগর, ভারত মহাসাগর। আটলান্টিক থেকে অনেক বড় বড় উপসাগর বের হয়েছে, এগুলোকে নদী বলা হয়ে থাকে।···উপরে উল্লিখিত অপর যে উপসাগর তার নাম বারবারা, এডেন থেকে যানজ পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। তারপরে আর জাহাজ যায় না, কারণ পথ বিপদসংকুল। নদী অতঃপর আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে।[১]

গ্রানাডার সুবিখ্যাত ভূ-পর্যটক আবু হামিদ (ওফাত ৫৬৫ হি.) তাঁর বই 'তুহফাতুল-আলবাবে' সাগর-মহাসাগরের এই একত্রে মিলন বা মহাসমাবেশের বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

> আপনারা নিশ্চয়ই জানবেন যে, بحر محيط (আটলান্টিক মহাসাগর) দুনিয়াকে ঘিরে আছে এবং মহাসাগরের মাঝে দুনিয়ার এই ভূখণ্ড যেন পুকুরের মাঝখানে একটি গোলক বা বলের মত। যেটিকে بحر ظلمات বলা হয় সেটি হল কৃষ্ণ সাগর। এখানে জাহাজ চলাচল করে না। ভারত মহাসাগর এর একটি উপসাগর। চীন সাগর এরই একটি শাখা। লোহিত সাগরও একটি উপসাগর। পারস্য উপসাগরও এরই একটি অংশ। একই অবিচ্ছিন্ন সাগর বসরা, আবাদান, সিরাফ, কারমান, বাহ্‌রাইন, কায়েস, দাইবাল, আবিসিনিয়া, যান্‌জ, শরনদ্বীপ ও চুলিয়ানের পাশ দিয়ে গেছে। উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত সব নদীই এই এক কৃষ্ণসাগরে পড়েছে, একেই বলা হয় بحر محيط।[২]

১. "মু'জামুল-বুলদান", ইয়াকুত কৃত, পৃঃ ১৯১ (মিসর সংস্করণ)।
২. ঐ, প্যারিস সংস্করণ, পৃ. ৯১-৯২।

কিন্তু মহাসাগরের সবচেয়ে উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন আবুল ফিদা (ওফাত ৭২৫ হি.)। তাঁকেও আবার অতিক্রম করে গেছেন ইবন খালদুন (ওফাত ৮০৮ হি.)। আবুল ফিদার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

পশ্চিম আটলান্টিকের যে অংশের কিনারায় মরক্কো এবং স্পেন অবস্থিত তার নাম اوقيانوس. এর মধ্যে খালিদাত দ্বীপগুলো অবস্থিত, কিনারা থেকে তাদের দূরত্ব কয়েক ডিগ্রী। এই আটলান্টিক সাগর মরক্কো উপকূল থেকে সোজা দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছে, তারপর বারবার ও সুদানের মধ্যবর্তী লামতুনা মরুভূমি পার হয়ে চলে গেছে। অতঃপর এই সাগর দক্ষিণের জনমানবহীন, অচেনা এলাকা অতিক্রম করে বিষুব রেখাতে পেঁছেছে, তারপর পূবের কামার পাহাড় ঘুরে গেছে। এই পাহাড় থেকে মিসরের নীল নদ উৎপন্ন হয়েছে। সমুদ্র অতঃপর দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে, তারপর পূবে আফ্রিকার জনহীন অঞ্চলের দিকে গেছে। সেখান থেকে পূব ও উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে ভারত মহাসাগর ও চীন সাগরের সঙ্গে মিশেছে। তারপর পূবদিকে যেতে যেতে চীনের পূবদিক থেকে উত্তরে গেছে, সেখান থেকে আবার পূবে গিয়ে চীন ছাড়িয়ে ইয়াজুয-মাজুযের্ দেওয়াল পর্যন্ত পেঁছেছে। সাগর আবার ঘুরে অজানা জায়গা পার হয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং স্থলভাগ ছাড়িয়ে উত্তরে গেছে। তারপর স্থলভাগ পরিবৃত হয়ে প্রথমে পশ্চিমে ও পরে দক্ষিণে গিয়ে জমিনের সঙ্গে মিলেছে। সেখান থেকে আবার পশ্চিমে গিয়ে বিভিন্ন জাতির অবিশ্বাসীদের উপকূলভূমি পার হয়ে রোমের (ইটালী) উল্টোপাড়ে গেছে। রোম অতিক্রম করে রোম এবং স্পেনের মধ্যবর্তী দেশ ঘেঁষে তারপর স্পেনের উপকূলভাগ অতিক্রম করে গেছে। তারপর স্পেনের পশ্চিম দিক ঘুরে দক্ষিণে গিয়ে স্পেন দেশ পার হয়ে সাবতার বিপরীতে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, আবার সেখানেই এসে মিশেছে।[১]

ইবন খালদুন তাঁর বই-এর ভূমিকায় সাগরের নিম্নরূপ বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন ঃ

ভৌগোলিকগণের মতে ভূমধ্যসাগর চতুর্থ ইকলিমের (اقليم) পশ্চিম পাশে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে بحرو محيط আরম্ভ হয়েছে। বারো মাইল প্রশস্ত একটি উপসাগর থেকে এটি বের হয়েছে—তানজা ও তারিফের মাঝখান থেকে; উপসাগরের নাম যাকাক। তারপর ভূমধ্যসাগর

১. "তাকবিমুল-বুলদান" পৃ. ২০।

পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং ক্রমে ৬০০ মাইল প্রশস্ত হয়েছে। চতুর্থ ইকলিমে এই সাগর শেষ হয়েছে এবং শুরু থেকে এ পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ১১৬০ ফার্লং। সিরীয় উপকূলভূমি এর কিনারায় অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে পশ্চিম (উত্তর আফ্রিকার) কূলভূমি-এর শুরু একটি অপ্রশস্ত উপসাগর থেকে। তারপর আফ্রিকার, তারপর আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত বারকা। উত্তরে কনস্টানটিনোপলের উপকূলভূমি, তারপর বানাদিকা (ভেনিস), রোম (ইটালী), ফ্রান্স ও স্পেনের উপকূল ও তারপরে তারীফ—যাজাকের নিকটবর্তী এবং তানজার উল্টোদিকে। ভূমধ্যসাগর ও সিরিয়া সাগর এই দুটিই এর নাম। এতে অত্যন্ত জনবসিপূর্ণ দ্বীপ রয়েছে অনেক, যথা ক্রীট, সাইপ্রাস, সিসিলী, মেজর্কা, সার্ডিনিয়া এবং দেনিয়া।

ভূগোলবেত্তাগণ বলেন যে, ভূমধ্যসাগরের উত্তরের উপসাগর থেকে আরো দুটি সাগর বের হয়েছে। একটি কনস্টানটিনোপলের বিপরীতে। ভূমধ্যসাগর থেকে এক তীর পরিমাণ দূরত্বে অবস্থিত একটি সরু জায়গা থেকে এটির উৎপত্তি এবং তিনটি নদী পার হয়ে এটি কনস্টানটিনোপলে পৌঁছেছে, পরে চার মাইল প্রশস্ত হয়ে ৬০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এর নাম কনস্টাটিনোপলের উপসাগর। এর ছয় মাইল প্রশস্ত মোহনা থেকে এটি হয়েছে কৃষ্ণসাগরের উপনদী এবং পাশ ফিরে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং بحر وقلية অতিক্রম করে খামারে গিয়ে শেষ হয়েছে। সর্বমোট ১৩০০ মাইল অতিক্রম করেছে। এই সাগরের উত্তর পাশে বাস করে রোমীয়রা, তুর্কীরা, বুরজানরা ও রুশীয়রা। ভূমধ্যসাগরের আরেকটি উপসাগর থেকে দ্বিতীয় আরেকটি সাগর উৎসারিত হয়েছে, সেটির নাম بحر بنادقة। উত্তরে ইটালী থেকে শুরু হয়ে পর্বতমালায় পৌঁছে পশ্চিমমুখী হয়ে বানাদিকা (ভেনিস) ও রোমের দিকে ঘুরেছে। এটি ভেনিস উপসাগর নামে পরিচিত। ভৌগোলিকগণ বলেন যে, আটলান্টিকের ওপারে ১৩° পূর্বে এবং বিষুব রেখার উত্তরে আরেক বিশাল সাগর রয়েছে। সেই সাগর দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে প্রথম ইকলিমে (قلم) গিয়ে শেষ হয়েছে। তারপর সেটা ইকলিমের পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে আবিসিনিয়া, ইথিওপিয়া ও বাবেল মন্ডপ পর্যন্ত গিয়েছে; এখানে সাগর ৪,৫০০ ফার্লং প্রশস্ত। এর নাম ভারত মহাসাগর, চীন সাগর ও আবিসিনিয়া সাগর। এর উপকূলে দক্ষিণ দিকে রয়েছে যানজ ও বারবারা; ইমরুল কায়েসের কবিতায় এই দেশ দুটির নাম উল্লিখিত আছে। কিন্তু পশ্চিমে (উত্তর আফ্রিকা) বারবার নামে যে এক গোত্র আছে এটা সে বারবারা নয়। তারপরে মাকদাশুয়া [illegible] সাফালা এবং ওয়াকওয়াক

(জাপান ?)। উত্তরে এর উপকূলে শুরুর দিকে রয়েছে চীন, তারপর ভারত ও সিন্ধু। তারপরে ইয়ামান উপকূল, আহকাফ, যুবাইদ ইত্যাদি। সমুদ্রের শেষপ্রান্তে রয়েছে যানজ এবং তারপরে আবিসিনিয়া। ভৌগোলিকগণ বলেন যে, আবিসিনিয়া সাগর থেকে আরো দুটি সাগর বহির্গত হয়েছে। তাদের একটি বাবল মণ্ডপ থেকে শুরু হয়েছে এবং উত্তরে অগ্রসর হতে হতে ক্রমেই প্রশস্ত হয়েছে, কিছুটা পশ্চিম দিকে গেছে এবং মোট ১৪০০ মাইল অতিক্রম করে পঞ্চম ইকলিমে কুলযুমে গিয়ে শেষ হয়েছে। এর নাম ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর। ফুস্তাত-ই-মিসর এখান থেকে তিন বিশ্রাম দূরে অবস্থিত। এর উপকূল পূর্বদিকে ইয়ামান কূলভূমি এবং তারপরে আলহিজাজ ও জিদ্দা। মাদায়েন, এলা (আকবা) ও ফারান-এর শেষ প্রান্তে অবস্থিত। পশ্চিম দিকে রয়েছে নিম্ন মিসরের কূলভূমি; আইযাব সাওয়াকিন, যিলা (আরায়েটারিয়া) ও আবিসিনিয়া হচ্ছে এর নিম্নাঞ্চলের দেশ। এর একেবারে শেষ প্রান্তে কুলযুম ভূমধ্যসাগরের উল্টোদিকে আরীশের কাছে। ইসলামী যুগে, এমন কি তারও আগে, অনেক রাজা-বাদশাহই এই দুই সাগরের মাঝখানের সরু ভূ-ভাগে (সুয়েজ) খাল কেটে সংযোগ স্থাপন করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তা পারেন নি।

অপর সাগরটি আবিসিনিয়া থেকে শুরু হয়েছে, সেটি আখদার সাগর নামে পরিচিত। এটি সিন্ধু এবং ইয়ামানের আহ্কাফের মাঝে অবস্থিত। সামান্য পশ্চিম দিকে উত্তরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ৪৪০ ফার্লং প্রবাহিত হয়ে দ্বিতীয় ইকলিমের ষষ্ঠভাগে বসরা উপকূলের ওবুল্লার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এর নাম পারস্য সাগর। পূর্বদিকে এর উপকূলে রয়েছে সিন্ধু, মেকরান, কিরমান ও পারস্য। এর শেষ প্রান্তে অবস্থিত ওবুল্লা। পশ্চিম দিকে বাহরাইন, ইয়ামামা, ওমান ও শাহর। আহকাফ এর নিম্নাঞ্চলের দেশ। পারস্য সাগর ও কুলযুমের মাঝখানে অবস্থিত আরব উপদ্বীপ, মূল ভূভাগ থেকে একটা হাতের মত যেন সাগরে মাঝে প্রসারিত হয়ে রয়েছে। আরবের দক্ষিণে আবিসিনিয়া সাগর, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। পূবে পারস্য সাগর এবং ইরাক পর্যন্ত, বসরা ও সিরিয়ার মাঝপথে, ১৫০০ মাইল জোড়া এর অবস্থিতি।

সাগরের পরিমাপ

ইবনে খালদুনের সমুদ্রযাত্রা স্পেন থেকে মিসর এবং আল-হিজাজ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। উপরিউক্ত বর্ণনা, তাঁর নিজের মতানুযায়ী, ইদ্রিসীর (৫৪৮ হিং) ভূগোল অনুসারে প্রদত্ত। এই বর্ণনায় সাগরের দৈর্ঘ্য ও দূরত্বের

বর্ণনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। টলেমীর ভূগোলেও আমরা সাগরের অনুরূপ মাপ পাই, কিন্তু তাতে যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। মশিয়ে লে বোঁ তাঁর "সিভিলাইজেশন অব অ্যারাবিয়া" বই-এ লেখেন ঃ

> টলেমী তাঁর আবিষ্কৃত শহরগুলোর বর্ণনা করতে গিয়ে অনেকখানে ভুল করেছেন। যেমন ভূমধ্যসাগরকে ৪০০ ফার্লং দীর্ঘ বলে ভুল বর্ণনা করেছেন। ভূগোলের ক্ষেত্রে আরবদের অগ্রগতি গ্রীক অবদানের সঙ্গে যথার্থভাবে তুলনা করা যায়। সে তুলনা থেকে বোঝা যাবে যে, আরবদের গবেষণায় কেবলমাত্র দ্রাঘিমাংশের ক্ষুদ্রতম বিষয়ে সামান্য হেরফের হয়, আর গ্রীকরা দ্রাঘিমাংশের ভ্রান্তিজনক হিসাব করেছে। যে সময়ে কোন নির্ভরযোগ্য ঘড়ি ছিল না, চাঁদের অবস্থান পরিবর্তনের কোন নকশাও ছিল না। সে সময়ে দ্রাঘিমাংশ সম্বন্ধে আদৌ কিছু জানা অত্যন্ত কঠিন ছিল; তাই আরবরা দ্রাঘিমাংশের হিসাবে ভুল করেছিল কিন্তু কোনখানেই তাদের ভুল দুই ডিগ্রীর বেশী হয়নি, গ্রীকদের ভুলের তুলনায় তাদের ভুল অতি সামান্য। উদাহরণস্বরূপ টলেমী আলেকজান্দ্রিয়া থেকে তানজার অক্ষাংশ দেখিয়েছেন ৫৩°৩০´; কিন্তু সঠিক হিসাব হল ৩৫°৪১´; টলেমীর হিসাবের সঙ্গে হেঁরফের হয় ১৮° ডিগ্রীর। তানজা থেকে ত্রিপোলী পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের যে পরিমাপ আরবরা দেখিয়েছে, তাতে মাত্র ১° ডিগ্রীর হেরফের হয়। টলেমী তাঁর মানচিত্রে ভূমধ্যসাগরকে ১৯° বেশী লম্বা দেখিয়েছেন, যার ফলে ৪০০ ফার্লং-এর হেরফের হয়ে গেছে।

অনুরূপভাবে ইবনে খালদুন লোহিত সাগরের দৈর্ঘ্য উল্লেখ করেছেন ১৪০০ মাইল। আধুনিক হিসাবে লোহিত সাগরের দৈর্ঘ্য হল ১৩১০ মাইল। এ থেকে বুঝা যায় যে, আরবদের পরিমাপ আধুনিক গবেষণার সঙ্গে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বেরিং সাগর

আলাস্কা এবং এশীয় উত্তর রাশিয়ার মাঝখানে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যে জলরাশি তারই নাম বেরিং সাগর। অতি সাম্প্রতিককালের আগে পর্যন্ত কেউ এই এলাকা অতিক্রম করেছেন বলে জানা যায় না। ভিটাস বেরিং নামক একজন অভিযাত্রী প্রথম এটি অতিক্রম করেন। এই সাগর উত্তর মেরুর খুবই নিকটবর্তী হওয়া হেতু সব সময়ই বরফে ঢাকা থাকে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, আরবরা এটির অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত ছিল।

সুলায়মান (২২৫ হি /৮৩৯ খৃঃ) চীন সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর ও উত্তর মহাসাগর হয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যে সংযোগ-পথের বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, এই পথটি তাঁর জানা ছিল বা এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল। আবুল ফিদার (৭৩২ হি.) বর্ণনাঃ

> ভেরিং সাগরের বর্ণনাঃ আবু রায়হান বেরুনীর লেখা এবং নাসির তুসীর "তাযকিরা" ছাড়া আর কোনখানে আমি এই সাগরের বর্ণনা পাইনি। তাই আমি আল-বেরুনীর লেখা থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন যে, ভেরিং সাগর উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ অংশ থেকে শুরু হয়েছে। এই সাগরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথেষ্ট। ভেরিং নামক একটি গোত্রের লোক এই সাগরের উপকূলে বাস করে।[১]

আল-বেরুনী এবং নাসীর তুসী মারা যান যথাক্রমে ৪৪০ হিজরী ও ৬৭২ হিজরীতে। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বেরিং (ভেরিং) নামটি মুসলিম পন্ডিতগণের অনেক আগে থেকেই জানা ছিল। আবু রায়হান বেরুনীর বাড়ী ছিল খারিযম (খিভা). এর একদিকের সীমান্তে রাশিয়া অবস্থিত। তাঁর আমলে বুলগারের রাজা (আধুনিক বুলগেরিয়া—যা রাশিয়ার শেষ প্রান্তে অবস্থিত, তা নয়) ইসলাম কবুল করেন এবং আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্, বাগদাদ থেকে আজারবাইজান ও রাশিয়ার মধ্য দিয়ে বুলগারে দূত প্রেরণ করেন। এই দৌত্যের নেতৃত্ব করেন ইবন ফযলান। এই ইবন ফযলান বাগদাদ থেকে রাশিয়া এবং সেখান থেকে বুলগার পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণের একটি বিবরণী লিখে গেছেন। সেই বিবরণীর একটি সংক্ষিপ্তসার লিখেছেন ইয়াকুত তাঁর "মু'জাম" গ্রন্থে। তদুপরি, আল-বেরুনী যে সময়ে গজনীতে বাস করতেন তখন গজনী সাম্রাজ্য চীনা তুর্কীস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর তুসী বাস করতেন তাতারদের যুগে, তারা রাশিয়া থেকে বাগদাদ পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্থানে যেত। অতএব আল-বেরুনী এবং তুসী যে বেরিং সাগর সম্বন্ধে জানতেন এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। সংক্ষেপে যে দুটি পথ আরব সাগর থেকে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে এক সঙ্গে মিশেছে। আরবরা সেই পথ দুটি জানতো। সুলায়মান হিজরী তৃতীয় শতকের শুরুতে যে পথের বর্ণনা করে গেছেন চতুর্থ হিজরীতে সুবিখ্যাত আরব নাবিক মাসুদীও সেই পথের উল্লেখ করেছেন।[২]

আরবদের নির্দেশিত দুটি সমুদ্র পথ হচ্ছেঃ

১. প্রথমটি আরব সাগর থেকে চীন সাগর পর্যন্ত, তারপর উত্তর প্রশান্ত

---

১. "তাকবিমুল-বুলদান" পৃ. ৩৫।

২. "মুরুযুদ্-দাহাব" ১ম খন্ড পৃ. ৩৬৫ (প্যারিস সংস্করণ)।

মহাসাগর পার হয়ে গিয়ে বেরিং সাগরে প্রবেশ করত। তারপর বেরিং সাগরের পিছন দিক হয়ে উত্তর মহাসাগরে প্রবেশ করত, তারপর আটলান্টিকে পড়ত এবং জিব্রাল্টার অন্তরীপ অতিক্রম করে গিয়ে ভূমধ্যসাগরে পড়ত।

২. দ্বিতীয়টি ভারত মহাসাগর থেকে আবিসিনিয়া সাগর, সেখান থেকে যানজ এবং বারবার—যাকে বর্তমানে মোজাম্বিক চ্যানেল বলা হয়ে থাকে—তারপর উত্তমাশা অন্তরীপ, সেখান থেকে আফ্রিকার উপকূলভূমি পার হয়ে জিব্রাল্টার অন্তরীপ হয়ে গিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়ত এবং তারপর গিয়ে ভূমধ্যসাগরে পড়ত। ভাস্কো ডা-গামা এই পথেই পর্তুগাল থেকে ভারতে এসেছিলেন।

বিভিন্ন সাগরের নাবিক

মাসুদীর বিবরণ থেকে (৩৩২ হি.) আমরা জানতে পারি যে, বিভিন্ন সাগরের জন্যে আলাদা আলাদা নাবিক ও বিশেষজ্ঞ থাকতেন। ভূমধ্যসাগরের এরূপ সুদক্ষ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল; তাঁদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:

> ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধ জাহাজ এবং সওদাগরী জাহাজের নাবিকদের আমি দেখেছি।...জাহাজের কর্মচারী, কর্মকর্তা, যোদ্ধা, চালকগণের সঙ্গেও আমি দেখা করেছি, আলাপ করেছি। তাঁদের একজন হলেন আবুল হারিস লাওয়ী; দামেশ্ক উপকূলের সিরীয়-ত্রিপোলীর শাসকের গোলাম। তাঁদের মতে ৩০০ হিজরীর পরে ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অনেক বেড়ে গেছে এর উপসাগরের সংখ্যাও হয়েছে অসংখ্য। সিরিয়ার হিমসের প্রধান যিনি—তাঁর উযীরের পুত্র আবদুল্লাহ্‌ও আমাকে অনুরূপ তথ্য প্রদান করেছেন। বর্তমানকালে (৩৩২ হি.) ভূমধ্যসাগর সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করার মত ব্যক্তি আর কেউ নেই, প্রবীণগণের মধ্যেও নেই। যুদ্ধ জাহাজ এবং সওদাগরী জাহাজের নাবিক সবাই তাঁর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন। তাঁর তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতার প্রতি প্রত্যেকেরই বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। ভূমধ্যসাগরে গ্রীকদের বিরুদ্ধে তিনি যে যুদ্ধ করেছিলেন তা-ও সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন।[১]

অনুরূপভাবে তিনি আফ্রিকার সাগরে এবং বারবারাতে আরব নাবিকগণের বর্ণনা প্রদান করেছেন:

---

১. "মুরুযুদ্-দাহাব", ১ম খন্ড, পৃ. ২৮২ (প্যারিস সংস্করণ)।

ওমানের নাবিকেরা এই সাগরে (আবিসিনিয়া সাগর) কানবুল্‌ (মাদাগাস্কার) দ্বীপ পর্যন্ত যাতায়াত করে। মুসলমানরা এই শহরেও ইথিওপীয় কাফিরদের সঙ্গে বাস করে। ওমানের এই আরব নাবিকেরা স্বীকার করে যে, বারবারা উপসাগরে (মোজাম্বিক চ্যানেল) দূরত্ব তাদের অনুমানের চেয়ে বেশী। আর বলে যে, এটা হচ্ছে ক্ষ্যাপা সাগর। এই সাগরে যারা চলাচল করে তারা হচ্ছে ওমানের আয্‌দ্‌ গোত্রের লোক। তারা যখন সাগরের ঢেউ-এর মধ্যে পেঁছায় আর স্রোতের অনুকূলে চলতে থাকে, জাহাজ তখন ঢেউয়ের দোলায় বহু উপরে ওঠে আর নামে। সে সময়ে জাহাজে কাজ করতে করতে তারা গান গায় ঃ

بربرا وجفوني   وموجك المجنون
جفوني وبربرا   وموجها كما ترى

বারবারা আর জাফনী   আর তোমাদের পাগলা ঝড়
জাফনী আর বারবারা   দেখরে ভাই ঢেউ কেমন।

আবিসিনিয়া সাগরে সবচেয়ে দূরে পর্যন্ত তারা পেঁহিতে পেরেছিল—কানবুল্‌, সাফালা, ওয়াকওয়াক, যান্‌জের (আবিসিনিয়া) শেষ সীমানা এবং যান্‌জ সাগরের নিম্নভাগ যা সিরাফের অধিবাসীরা পার হয়ে থাকে। আমি সুহারের উদ্দেশ্যে একদল নাবিকের সঙ্গে জাহাজে উঠেছিলাম—তাঁদের নিজেদেরই জাহাজ ছিল। তাঁদের নাম মুহাম্মদ বিন যায়দ বুদ, জওহর বিন আহ্‌মদ ওরফে ইবন সাবরাহ্‌। এই সাগরে ডুবেই তাঁদের মৃত্যুর হয়। আহমদ এবং আবদুর রহিমের ভাই আবদুস সামাদের জাহাজে করে ৩০৪ হিজরীতে আমি কানবুল্‌ থেকে যাত্রা করে ওমান পর্যন্ত গিয়েছিলাম। এই দুই ভাই-ই তাঁদের সঙ্গীসাথী সমেত এবং জাহাজসহ সাগরে ডুবে মারা যান। এই সাগরে সেটাই ছিল আমার শেষ সফর।—বিভিন্ন সাগরেই আমি কয়েকবার সফর করেছি, যথা, চীন সাগর, ভূমধ্যসাগর, জাপান সাগর ও ইয়ামান সাগর, এবং বহু দুর্যোগও ভোগ করেছি, কিন্তু এই بحر زنج (আবিসিনিয়া সাগর)-এর ভয়াবহ দুর্যোগ আর কোন সফরে হয়নি।

এ সব বিবরণ থেকে সমুদ্র যাত্রাকালে আরব নাবিকদের বীরত্বের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। উপরের বর্ণনার কানবুল্‌ হচ্ছে মাদাগাস্কার। আর আধুনিক জাপান দ্বীপপুঞ্জকে আরবরা বলত—ওয়াকওয়াক।[১]

---

১. "আজাইবুল-হিন্দ" বুযর্গ ইবন্‌ শাহরিয়ার কৃত, পৃ. ১৭৫।

সাত

আরব নাবিক

জ্ঞানী ও সুচতুর ভৌগোলিকগণ এই পৃথিবীর জমিন ও সাগরের পরিমাপ করে বিভিন্ন অংশের দূরত্ব এবং সীমানা চিহ্নিত করে গিয়েছিলেন; আর আরব নাবিকগণ তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা পূর্বের হিসাব ও মাপকে সমর্থন, সংশোধন বা ভুল প্রমাণ করে গেছেন। মাসুদী লিখেছেন, "আমি দেখেছি যে, চীন সাগর, ভারত মহাসাগর, সিন্ধু নদ, আবিসিনিয়া সাগর, ইয়ামান সাগর ভূমধ্যসাগরের নাবিকগণ আবিসিয়া সাগরের দূরত্ব ও গভীরতা সম্বন্ধে দার্শনিকগণের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এই সাগরের এমন বহু স্থান রয়েছে যেগুলো মাপা হয়নি। অনুরূপভাবে ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধরত এবং সওদাগরী উভয় ধরনের জাহাজের নাবিকগণের জ্ঞানও দার্শনিকগণের ধারণা অপেক্ষা ভিন্নতর।[১]

জোয়ার-ভাটা সম্বন্ধে এই সকল তথাকথিত অশিক্ষিত নাবিকগণের পর্যবেক্ষণও বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন দার্শনিকগণের ধারণা থেকে ভিন্ন। এই নাবিকগণের তথ্যাবলী ছিল বাস্তব জ্ঞান-নির্ভর। মাসুদী বলেন ঃ

এই সাগরে চলাচলকারী নাবিকগণ জানেন যে, কখন হাওয়া প্রবাহিত হবে—তাঁরা তাঁদের পরবর্তী পুরুষের নাবিকগণকে নিজেদের অভিজ্ঞতা দান করে যান এবং রাজনৈতিক প্রশিক্ষণও প্রদান করে যান, কেননা তাঁরা হাওয়া আর ঢেউ-এর গতি জানেন; কখন সাগর উত্তাল হবে আর কখন শান্ত হবে তা-ও তারা জানেন।

এখানে আবিসিনিয়া সাগরের কথা বলা হয়েছে এবং একই কথা রোমীয় ও মুসলিমগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; যারা ভূমধ্যসাগর এবং কাস্পিয়ান সাগরে জুরজান, তাবারিস্তান ও দাইলাম পর্যন্ত চলাচল করতেন।[২]

এসব তথ্যের সবচেয়ে ভাল উৎস হল "সমুদ্রের সিংহ" নামে পরিচিত নবম শতকের বিখ্যাত ইবন মাজিদ লিখিত অর্ধেক গদ্য ও অর্ধেক কবিতায় লিখিত বই এবং সুলায়মানের লেখা বই, যেটির অনুলিপি ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস থেকে মুদ্রিত হয়েছে। বাশ্শারী মুকাদ্দাসী হিজরী

১. "মুরুযুদ-দাহাব," ১ম খন্ড, পৃ. ২৪১।
২. ঐ, পৃ. ২৪৩।

৪র্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুসলিম দেশসমূহ সফর করেন। তিনি দুটি সাগর পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণনা করেছেন :

> মুসলিম দেশসমূহে আমি মাত্র দুটি সাগর দেখেছি। তাদের একটি পূর্বদিক থেকে চীন এবং সুদানের (উত্তর আফ্রিকা) মধ্যে অবস্থিত। ইসলামী এলাকায় এসে এটি আরব দ্বীপ ঘুরে গেছে। আমি মানচিত্রে যেরূপ দেখেছি ঠিক সেরকম।......আরেকটি সাগরের বহির্মুখ হল অনেক পশ্চিমে সস্ এবং স্পেন পার হয়ে। আটলান্টিক থেকে প্রশস্ত হয়ে বেরিয়ে পরে এটি অপেক্ষাকৃত সরু হয়ে গেছে। তারপর আবার এটি প্রশস্ত হয়ে সিরীয় উপকূলভূমি ধরে প্রবাহিত হয়েছে।

এরপরে তিনি লিখেন :

> এই দুটি সাগর আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে নাকি আটলান্টিক মহাসাগর থেকে উদ্‌গত হয়েছে তা আমি জানি না; কিন্তু মনে হয় যেন দুটি সাগরই প্রবাহিত হতে হতে গিয়ে আটলান্টিকে পড়েছে, কেননা ফারগানার (তুর্কীস্তান) কাছাকাছি আসার পর থেকে মিসর এবং সুদূরের পশ্চিম পর্যন্ত কেবলই অবতরণ করে যেতে হয়। ইরাকের লোকেরা পারস্যের লোকদের বলে 'উজান অঞ্চলের লোক' আর পশ্চিম অঞ্চলের লোকদের বলে 'ভাটি অঞ্চলের লোক'। এ থেকেও আমার মতের সমর্থন পাওয়া যায় এবং প্রমাণিত হয় যে, এ দুটিই নদী এবং আটলান্টিক মহাসগরে গিয়ে পড়েছে। (পৃ. ১৬)

হিজরী ৯ম শতকের দুঃসাহসী নাবিক আহমদ ইবন মজিদ দাবী করেন যে, তিনিই বারবারা আবিষ্কার করেন। তিনি সমুদ্রপথে এই স্থানে পৌছানোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত এই স্থানের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। (পৃ. ৪৬)

ভারত মহাসাগর যে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত তাও তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন বলে কথিত আছে, কারণ তিনি লিখেছেন যে, সাগরের পর সাগর পার হয়ে তিনি মিসর পর্যন্ত সফর করেছিলেন। তাঁর সঠিক ভাষায় : لان البحر الهندى هو متعلق البحر المحيط (কেননা ভারত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত)। (২য় খণ্ড, পৃ. ২৭)

২৩০ হিজরীতে একবার এবং ২৪৪ হিজরীতে পুনরায় এক অজ্ঞাত গোত্রের অধিবাসীরা বহু সংখ্যক যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে স্পেনের উপকূলে এক সাংঘাতিক হামলা চালায়। এর ফলে উপকূল এলাকার অধিবাসীরা বিপ-

র্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন আবদুর রহমান ইবন হাকাম হামলাকারীদের পরাস্ত করেন এবং সমুদ্রের কিনারায় যে একটি মিনার স্পেনীয় উপকূল নির্দেশ করত সেটি ধূলিস্মাৎ করে দেন। এই নৌ-হামলাকারীরা কারা ছিল ? কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, এরা ছিল মেজীয় অর্থাৎ তাঁদের মতে অমুসলিম বা কিতাবী নয় এমন কোন জাতি। ইবন সাঈদ মাগরাবী, যাকারিয়া কাযওয়ানী ও মাক্কারীর মতে তারা ছিল ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের অধিবাসী।[১] কোন কোন পন্ডিতের মত যে, তারা ছিল রাশিয়ার লোক। আলেকজান্ডার সীপেট اخبار امم المجوس من الارمان وفرنك والروس নামক বই-এ সকল মুদ্রিত বই এবং পান্ডুলিপি থেকে এই হামলা সংক্রান্ত আরবী তথ্যাবলী সংগ্রহ করেছেন। মুসলিমদের সঙ্গে উপরিউক্ত গোত্রের এই প্রচন্ড যুদ্ধের সন ছিল ২৪৫ হিজরী।[২] মাসুদী (৩০২ হি.) মনে করেন যে, এই অভিযানকারীরা ছিল রাশিয়ার পৌত্তলিক লোক। তিনি আরো বলেন যে, এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে রুশীয়রা بحر نيطس (কৃষ্ণ সাগর) থেকে مانيطس এ এসে স্পেন জয় করতে পারত।

প্রমাণিত হয়েছে যে, আরবরা ইউরোপ থেকে স্পেনে যাবার দুটি পথই জানত। একটি পথ ছিল ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড থেকে আটলান্টিক হয়ে এবং আরেকটি পথ ছিল রাশিয়া থেকে কৃষ্ণ সাগর, দার্দানেলিস ও ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে। মাসুদী (৩৩২ হি.) বহুসংখ্যক নাবিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে লিখেছেন যে, কাস্পিয়ান সাগর কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত নয়।[৩]

আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপসমূহ

স্পেনের পরে যে বিশাল সাগর, আরবরা তাকে বলত বাহ্‌রে জুলমাত بحر ظلمات ও বাহরে মুহীত بحر محيط। উত্তরে অবস্থিত কিছু সংখ্যক দ্বীপের কথা তারা জানত, একটিকে তারা বলত انقلطره। এবং আরেকটিকে বলত ارلندا। বলাই বাহুল্য যে, প্রথমটি ইংল্যান্ডের নাম আর পরেরটি আয়ারল্যান্ডের।

যেসকল আক্রমণকারী ২৩০ হিজরী ও ২৪৪ হিজরীতে স্পেন আক্রমণ করেছিল, কোন কোন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকের মতে তারা ছিল ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের অধিবাসী। ইবন সাঈদ মাগরাবী (৬৭০ হি.) লিখেন :

انكلترا। ও বৃটেনের উত্তরে আয়ারল্যান্ড অবস্থিত, সেটা ১২ দিনের পথে রসমান দীর্ঘ আর চারদিনের পথের সমান প্রশস্ত। এই দ্বীপের বিশৃঙ্খল

১. "মাজমু-ই-আখবার উমামুল-মাজুস" পৃ. ২৩-২৬।
২. "মুরুযুদ-দাহাব", ১ম খন্ড, পৃ. ৩৬৪।
৩. ঐ, পৃ. ২৭২।

অবস্থা সুবিদিত, এর অধিবাসীরা আগে ছিল ম্যাজীয় পরে প্রতিবেশীগণের প্রভাবে তারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এখান থেকে পিতল ও দস্তা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

কাযওয়ানী এখানকার পাখী এবং পাখী শিকারের রীতি সম্বন্ধে লিখে গেছেন। দামেশ্‌কের শামসুদ্দিন (৭২৮ হি.) বলেন যে, আটলান্টিক মহাসাগর থেকে যে শাখাটি উত্তর দিকে গেছে সেটির নাম بحر انكلطره (ইংলিশ চ্যানেল) (পৃ. ৩৭) সেখান থেকে সাদা রঙের বাজপাখী ইসলামী দেশসমূহে আনা হয়ে থাকে। (পৃ. ১৩৮ ও ১৪২)

২৪৪ হিজরীতে এই দ্বীপগুলো বিজয়ের পরে এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে স্পেনের শাসক আবদুর রহমানের একটি চুক্তি হয় এবং রাষ্ট্রদূত বিনিময় হয়। এ সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। আবদুর রহমান জনৈক গাযযাল নামক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে উপহার সামগ্রী সমেত জাহাজযোগে সেখানে পাঠান। তিনি বহু দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছেন এবং রাজার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। রাণী তাঁর প্রেমে পড়ে যান। তাঁদের সেই প্রেম-কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে ইবন দাহিয়ার ابن دحيت كتاب المطرب في اشعار اهل المغرب বই-এ।

তুলিদ্বীপ অবস্থিত ছিল সকলের উত্তরে। অপর প্রান্তে ছিল খালিদাত এবং সা'দাত দ্বীপ। فغرورين বা مغررين নামে পরিচিত একদল দুঃসাহসী স্পেনীয় নাবিক আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপসমূহের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। ইদ্রীসী এবং মাসুদীর বই-এ তাদের উল্লেখ রয়েছে।

চীন সাগরের দ্বীপসমূহ

আরবরা ভারত মহাসগর ও চীন সাগরে ব্যাপকভাবে চলাচল করত। চীন সাগরের প্রত্যেকটি দ্বীপে তারা পৌঁছেছিল যদিও সেগুলোর অধিবাসিগণের বর্বর আচরণের জন্যে বসবাস করতে পারেনি। কিন্তু জাভা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য ইন্দোচীন দ্বীপসমূহে তাদের বসতি বর্তমান রয়েছে। তারা এই দ্বীপগুলোর এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে গেছে যেন বর্ণনাকালে তাদের সামনে কোন মানচিত্র ছিল। আরবরা এই সকল দ্বীপে পৌঁছাতে এবং সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে যত প্রচেষ্টা করেছে সেসবের বর্ণনা পাওয়া যায় বুযর্গ বিন শাহরিয়ারের বই 'আজায়েবুল-হিন্দ'-এ। আরবরা জাভাকে বলত زابج, সুমাত্রকে বলত سرسبزه বা سو مطره আর জাপান দ্বীপপুঞ্জকে বলত ওয়াকওয়াক।

তারা জাপানের অধিবাসীদের উৎপাদন, নৌ-ভ্রমণ, কাঠের ঘরবাড়ি ইত্যাদির বর্ণনা করে গেছে।

ফিলিপাইন

বুযর্গ ইবন শাহরিয়ার (৩০০ হি.) চীন সাগরের এক আগ্নেয়গিরি দ্বীপের বর্ণনা করেছেন, সেটি অবশ্যই হবে ফিলিপাইন (আজায়েব উল-হিন্দ, পৃ. ২২)। তাঁর বর্ণনা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু চীন সাগরে নিঃসন্দেহে একটি আগ্নেয়গিরি দ্বীপ রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে ফিলিপাইন। এটা সুবিদিত যে, স্পেনীয়দের এখানে আসার বহু শতাব্দী আগে মুসলমানরা বসতি স্থাপন করেছিল। বলা হয়ে থাকে যে, ইসলাম গ্রহণ করার পরে তারা ভারতের বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চল থেকে এখানে আসতে থাকে এবং স্পেনীয় দখলের পূর্ব পর্যন্ত তাদের আগমন অব্যাহত ছিল।

অস্ট্রেলিয়া

বুযর্গ ইবন শাহরিয়ার তাঁর "আজায়েবুল-হিন্দ" বই-এ কিরমানের নাবিক আবহারার অদ্ভুত কীর্তিকলাপের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই নাবিক পারস্য উপসাগর থেকে চীন পর্যন্ত নিয়মিত সফর করতেন। এই দুঃসাহসী নাবিকই সর্বপ্রথম চীন সাগরে অভিযান করে কোন একটি দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পেঁছান সেখানে তার জাহাজ ডুবে যায়; কিন্তু তিনি একটি নৌকায় উঠে প্রাণরক্ষা করেন। তাঁর পিছনে আগত অন্যান্য জাহাজ তিনি রক্ষা করেন; সেসব জাহাজের মালপত্র ফেলে দিয়ে হাল্কা করে এক নির্জন দ্বীপের নিকট নিয়ে নিরাপদে চীন সাগরে পেঁাছিয়ে দেন (পৃ. ৮৮)। সেটি কোন দ্বীপ? সম্ভবত সেটি অস্ট্রেলিয়া।

মাদাগাস্কার

মোজাম্বিকের কাছে এই সাগরের আরো দুটি দ্বীপের উল্লেখ রয়েছে, একটিকে বলা হত কানবলু এবং আরেকটিকে কুমর। অধিকাংশ পণ্ডিত এই দুটি নামই মাদাগাস্কারের বলে ধরে থাকেন, কিন্তু আসলে কানবলু হল মাদাগাস্কার আর কুমর হল মাদাগাস্কারের নিকটস্থ কমরো দ্বীপ।

ভাস্কো ডা-গামার আরব পথ প্রদর্শক

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকাল থেকেই আরবরা জানত যে, ভূমধ্যসাগর থেকে আফ্রিকার উপকূল হয়ে ভারত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরে যাবার একটি পথ রয়েছে। পরবর্তীতে তুর্কীরা ৮৫৭ হিজরীতে (১৪৫৩ খৃী.) কনস্টান্টিনোপল দখল করে ভূমধ্যসাগরের অধিকর্তা হয়ে বসলে তখন ইউরোপীয়রা প্রাচ্যদেশে আসার জন্যে একটি নতুন পথের সন্ধান করতে থাকে। ৮৯৭ হিজরীতে আরব

আধিপত্য ধ্বংস করে তাদেরই পথ অনুসরণ করে স্পেনীয় ও পর্তুগালীয়রা উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং তাদের সাহসী নাবিকগণ সাগরের প্রত্যেকটি স্থানে অভিযান করতে থাকেন। একজন উদ্যোগী পর্তুগালীয় নাবিক ভাস্কো ডা-গামা আরবদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল থেকে আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে এসে পৌছান। সে সময়ে বিখ্যাত আরব নাবিক আহমদ ইবন মজিদ, যিনি নাকি ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে সমুদ্র যাত্রার কায়দা-কানুন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তিনিও সেখানে ছিলেন। আরবরা বলে যে, আহমদ নেশার বশবর্তী থাকা অবস্থায় ভাস্কো ডা-গামাকে ভারতে নিয়ে যান; সেখানে তিনি মসলা ব্যবসায়ের বড় বন্দর কালিকটে (মাদ্রাজ) নোঙর করেন। ইউরোপীয়দের মতে আহমদ পুরস্কারের লোভে তা করেছিলেন।

ভাস্কো ডা-গামা যে একজন আরব নাবিকের সহায়তা নিয়ে ভারতে পৌছেছিলেন এ কথা পর্তুগালীয় এবং আরব ঐতিহাসিক সকলেই স্বীকার করেন। গুজরাটের বিজ্ঞ পন্ডিত নেহরওয়ালার কুতুবুদ্দীন, যাঁকে গুজরাটের শাসনকর্তা মক্কাতে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ের উস্তাদ এবং সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন এবং যিনি (কুতুবুদ্দীন) মক্কার ইতিহাস الاعلام باعلام بيت الله الحرام ও তুরস্কের ইয়ামান বিজয়ের ইতিহাস البرق اليماني في الفتح العثماني গ্রন্থ রচনা করেন, তখন জীবিত ছিলেন। মক্কায় ইতিহাস গ্রন্থে তিনি আরব এবং ভারতের বন্দরসমূহে পর্তুগালীয়দের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন, আর البرق اليماني বই-এ তিনি পর্তুগালীয়দের আগমনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেন ঃ

> হিজরী ১০ম শতকে সংঘটিত সবচেয়ে বড় ঘটনাবলীর অন্যতম হল একটি ইউরোপীয় জাতির অর্থাৎ পর্তুগালীয়দের ভারতে আগমন। তাদের একটি দল সাবতার যাকাক থেকে রওনা হয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে কুমুর পর্বতের নিকটে আসে, সেখান থেকে নীল নদ উৎপন্ন হয়েছে। এই নাবিকের দল পূর্বদিকে এমন এক জায়গায় পৌছায় যা ছিল কিনারার নিকটবর্তী একটি যোজক, এর একদিকে একটি পর্বত এবং আরেকদিকে আটলান্টিক মহাসাগর। এখানে ঢেউ এমন ভয়াবহ যে জাহাজ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হত না এবং সব জাহাজই ডুবে

যেত। তখন পর্যন্ত যদিও বহু প্রাণহানি হয়েছিল এবং কেউ ভারত মহাসাগর পেঁছাতে পারেনি তথাপি তারা সামনে অগ্রসর হতে থাকে। অবশেষে তাদের একটি জাহাজ ভারতে পেঁছতে সক্ষম হয়, সেখানে তারা ভারত মহাসাগর সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান করতে থাকে এবং ঘটনাক্রমে আহমদ ইবন মজিদ নামক একজন অভিজ্ঞ নাবিক তাদের পথ প্রদর্শক হন। এই ইউরোপীয়দের প্রধান যাকে ওরা বলত دساندی[১] তিনি তাঁকে সব সময় সঙ্গে রাখেন এবং তাঁরা পরস্পরের ঘনিষ্ট সঙ্গী হন। তিনি (আহমদ ইবন মজিদ) নেশার ঘোরে তাঁর কাছে প্রকাশ করে দেন যে, কোন্ পথে যেতে হবে, তিনি তাঁকে সাবধান করে বলে দেন তিনি যেন সরাসরি উপকূলের কাছে না যান; সমুদ্র দিয়ে সোজা সামনে এগিয়ে গিয়ে উত্তাল সমুদ্র-এলাকা পার হয়ে তবে যেন কিনারার কাছে ভিড়েন। এই তথ্য প্রকাশ করে দেয়ার পরে তাঁর নেশার ঘোর কাটে এবং স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে আসে। এসময় থেকে বহু পর্তুগালীয় জাহাজ ভারত মহাসাগরে আসতে থাকে। তাদের নৌ-চলাচলের কেন্দ্র হয় গোয়া বন্দর।

পর্তুগালীয় ঐতিহাসিকগণ—না, ভাস্কো ডা-গামার একজন সহযাত্রী—এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। বারোস তা অতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ভাস্কো ডা-গামা যখন মালিন্দিতে ছিলেন সে সময়ে কয়েকজন বেনিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে আসেন গুজরাটের একজন মুর (মুসলিম), তাঁর নাম মালেমুকনা (মুয়াল্লিম কনক)।[২] ইনি আমাদের সাহচর্যের আনন্দে এবং মালিন্দির রাজাকেও খুশী করার জন্যে—কেননা রাজা পর্তুগালীয়গণের পথ প্রদর্শনের জন্যে একজন নাবিক খুঁজছিলেন—তাদের সঙ্গে যেতে রাজী হন (ভারতে যাবার পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে)। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর জ্ঞান দেখে ভাস্কো ডা-গামা খুব খুশী হন বিশেষ করে সেই মুর যখন তাঁকে ভারতের সমগ্র উপকূলভূমির মানচিত্র বের করে দেখালেন তখন। মুরদের সেই মানচিত্রে অক্ষাংশ ও দ্রাঘি-

---

১. পর্তুগালীয় ভাষায় তাঁকে বলা হয় المیرانتی। আর আরবীতে বলা হয় امیر البحر।

২. বলা হয়ে থাকে যে, কনক হচ্ছে একটি সংস্কৃত শব্দের তামিল উচ্চারণ যার অর্থ নৌ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সম্ভবত আহমদ ইবন মজিদ গুজরাটী বেনিয়াদের মধ্যে এই নামে পরিচিত ছিলেন।

মাংশ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে দেখানো ছিল। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের পরস্পর ছেদের ফলে সৃষ্ট চতুষ্কোণগুলো খুবই ছোট ছিল বলে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমের দুই ঘর দ্বারা উপকূলের নির্দেশ ছিল খুবই সঠিক; হাওয়ার গতি নির্দেশক কাঁটা ও চিহ্নসমূহের দ্বারা ভারাক্রান্ত ছিল না। আমাদের যে পর্তুগালীয় মানচিত্র অন্যেরা অনুসরণ করে থাকে সেগুলো নির্দেশক চিহ্ন ও কাঁটা দ্বারা ভারাক্রান্ত। ভাস্কো-ডা-গামা তাঁর নিজের বিশাল আকারের কাঠের তারার উচ্চতা মাপক যন্ত্রটি এবং ধাতুনির্মিত অন্যান্য যন্ত্র যেগুলোর সাহায্যে সূর্যের উচ্চতা পরিমাপ করা হত, সেগুলো সেই মূরকে দেখালেন। মূর সে সব যন্ত্রপাতি দেখে মোটেই বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। তিনি বললেন যে, লোহিত সাগরের আরব নাবিকগণ ত্রিকোণাকার পিতলের যন্ত্রপাতি এবং পাদ বা কোন পরিমাপকের সাহায্যে সূর্য ও ধ্রুবতারার উচ্চতা নির্ণয় করে থাকে; সমুদ্রের বুকে তারা ধ্রুবতারার সাহায্যই সবচেয়ে বেশী গ্রহণ করে। কিন্তু তিনি বললেন যে, তিনি নিজে এবং ক্যাম্বে ও হিন্দুস্তানের সকল নাবিক উত্তর ও দক্ষিণ আসমানের কিছু সংখ্যক তারা এবং আরো কতগুলো তারা যেগুলো পূব থেকে পশ্চিমে মধ্য আসমান অতিক্রম করে যায়, সেগুলোর সাহায্যে জাহাজ চালিয়ে থাকেন। ভাস্কো-ডা-গামার তারার উচ্চতা মাপের একটি যন্ত্র দেখে (ভাস্কো-ডা-গামা সেটি তাঁকে দেখান) তিনি বলেন যে, সেজন্যে তিনি ভিন্ন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে নিজের আসতারলাব যন্ত্রটি নিয়েও আসেন এবং ভাস্কো-ডা-গামাকে দেখান। সেটি ছিল তিন চাকতির তৈরী একটি যন্ত্র, মূররা যন্ত্রটি জাহাজ চালনার জন্যে ব্যবহার করত। আমরা পর্তুগালীয়রা জাহাজ চালনার জন্যে যে যন্ত্রটি ব্যবহার করে থাকি নাবিকগণ সেটিকে বলেন, এরবালেস্টিলাস। মূর নাবিকের সঙ্গে এই বিষয়ে এবং আরো অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করার পরে ভাস্কো-ডা-গামা বুঝতে পারেন যে, তিনি এক মহামূল্যবান সম্পদ লাভ করেছেন। তাঁকে যাতে হারাতে না হয় সেজন্যে তিনি অনতি-বিলম্বে জাহাজ ছেড়ে দেন এবং ২৪শে এপ্রিল, ১৪৯৮ তারিখে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।"[১]

১· এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, প্রবন্ধঃ শিহাবউদ্দিন আহমদ ইবন মাজিদ।

নৌ-চালনায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

নৌ-চালনার জন্যে সর্বাগ্রে যে জিনিসটির প্রয়োজন হত সেটি হল নক্সা। আরব নাবিকগণ নক্সা ধরে সমুদ্রপথে অগ্রসর হতেন, তাঁরা পূর্ববর্তিগণের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং তারপর নিজেদের অভিজ্ঞতা দ্বারা সেসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করতেন। হিজরী ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান বাশ্শারী মুকাদ্দাসী তাঁর "অহ্সানুত-তাকাসিম" বই-এ লিখেছেন যে, তিনি খোরাসানের সামানীয় আমীরের কুতুবখানায় একটি কাগজের উপরে আঁকা মানচিত্র এবং নিশাপুরের আবুল কাশেম ইবন আনমা'তির নিকট কাপড়ের উপরে আঁকা অপর একটি মানচিত্র দেখেছেন। তিনি আদ্দুদ্দৌলা এবং সাহিব ইবন আব্বাসের কুতুবখানাতেও মানচিত্র দেখেছেন। এগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার গরমিল ছিল। তিনি লিখেন :

> আমি দুই হাজার ফার্লং পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি এবং ভূমধ্যসাগর থেকে আবাদান পর্যন্ত আরবের উপকূলে বেড়িয়েছি। তাছাড়া যেসব দ্বীপে পানি নেয়ার জন্যে জাহাজ থামে, সেগুলোও দেখেছি। যে সব প্রবীণ নাবিক এই সাগরে জন্মগ্রহণ করেছেন, এই সাগরেই বড় হয়েছেন, আমি তাঁদের সঙ্গেও দেখা করেছি। তাঁদের কেউ জাহাজের কাপ্তান, কেউ যাত্রিগণের তত্ত্বাবধায়ক, কেউ গাণিতিক বা দালাল বা সওদাগর।
>
> সমুদ্র, বন্দর ও হাওয়া এবং দ্বীপসমূহ সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অন্য যে কোন লোক অপেক্ষা বেশী নির্ভরযোগ্য, তাই সমুদ্র ও সমুদ্রের সীমানা সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করেছি। তাঁদের নিকট অনেক নথিপত্র ও বই ছিল, সেগুলোর উপরই তাঁরা নির্ভর করতেন এবং সে সব নথি ও বইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা চলতেন। আমি তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছুর নকল তুলে নিয়েছি এবং তাঁদের মানচিত্রের সঙ্গে আমার মানচিত্রের তুলনা করে দেখেছি। (লাইডেন সংস্করণ, পৃ. ১০)

ইবন খালদূন তাঁর বইয়ের ভূমিকায় বলেন :

সমুদ্রে যাত্রার জন্যে ধরাবাঁধা নিয়ম রয়েছে, ভূমধ্যসাগর ও এর উপকূলবর্তী এলাকায় নাবিকেরা সে সব নিয়ম জানেন। এই নিয়মগুলো একটি নক্সার বইয়ে লেখা আছে। সমুদ্র, সমুদ্রের উপকূলস্থ দেশসমূহ, বন্দর, হাওয়ার গতি ও চলাচলের এলাকা এই সবই নক্সাতে লেখা ও আঁকা আছে; এই নক্সাকে বলা হয় দিক নির্ণয়ক। নাবিকগণ জাহাজ চালানোর সময়ে এই দিক নির্ণয়ক অনুসারে চালান। (মিসর সংস্করণ, পৃ. ৪৫)।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার উত্তর উপকূলে যখন আবর নাবিকের দেখা পান তখন আরব নাবিক তাঁকে নিজের মানচিত্রগুলো দেখতে দেন; সেই মানচিত্রগুলোতে আরবীয় পদ্ধতিতে ভারতের উপকূলভাগের বর্ণনা এবং বিভিন্ন স্থানের পারস্পরিক দূরত্ব নির্দেশিত ও বর্ণিত ছিল।

ভারতে নিযুক্ত পর্তুগালের রাজপ্রতিনিধি আলবুকার্কের নিকট একটি নৌ-মানচিত্র ছিল, সেটি তৈরী করেছিলেন উমর নামক একজন আরব নাবিক। ওমান সাগর ও পারস্য উপসাগরে চলার সময় এই মানচিত্র তাঁর সঙ্গে ছিল। (مجموعه مقتطف سماد بالرواد মিসর সংস্করণ, পৃ. ৪৬ অনুসারে) আহমদ ইবন মাজিদও একটি নৌ-মানচিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটিকে তিনি বলতেন, (راه نمه)-ار همانی পথ প্রদর্শক)। তিনি লিখেছেন যে, নাবিকগণ সমুদ্র যাত্রাকালে সেগুলো রাখতেন। ভূমধ্যসাগরের নাবিকেরা সেগুলোকে বলতেন দিকদর্শন। ইবন ফযলুল্লাহ্ উমরী (ওফাত ৭৪৯ হি. (১০৪৮ খৃ.) দিকদর্শন সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধানসমূহ مسالك الابصار في ممالك الامصار বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ল্যাটিন কম্পাস শব্দ থেকে আরবী রূপ كمبص কথাটি গৃহীত হয়েছে, শব্দটি সম্ভবত রোমীয় নাবিকগণের কাছ থেকে গৃহীত হয়ে থাকবে। আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের নাবিকেরা এটাকে বলত 'রাহনামা'।

বাতিঘর

মানচিত্রের পরে সমুদ্রে নৌ-চালনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হল বিপজ্জনক স্থানসমূহে মিনার ও বাতিঘর নির্মাণ। আরবরা মিনারা ব্যবহার করত। বাশ্শারী মুকাদ্দাসী লিখেন, "সমুদ্রের মধ্যে দীর্ঘ খুঁটি পোঁতা হয়। তার উপরে ঘর থাকে, রাত হলে কর্মচারীরা সেই ঘরে বাতি জ্বালায় যাতে আলো দেখে জাহাজ দূরে দিয়ে চলে।" (পৃ. ১৩, লাইডেন

সংস্করণ)। আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিখ্যাত বাতিঘরটির আরবদের আমলেও সুরক্ষিত ছিল। ইয়াকুবী (২৭৭ হি.) বলেন, "আলেকজান্দ্রিয়ার অন্যতম আশ্চর্য হল সেখানকার মিনারা, সেটি ১৭৫ হাত উঁচু এবং বিশাল বন্দরের মুখে অবস্থিত। মিনারার চূড়ায় আগুনের বড় পাত্র রয়েছে; চৌকিদার দূরে কোন জাহাজ দেখলে সেই পাত্রে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।"[১] পারস্য উপসাগরে বড় বড় খুঁটি গেড়ে চিহ্ন দেওয়া ছিল। মাসুদী خشبات البصرة-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেন: "কাঠের এই খুঁটিগুলো সমুদ্রে গাড়া হয়, এগুলো নির্দেশ করে যে, সেখান থেকে ওমানের দূরত্ব তিনশ ফার্লং।"[২] নাসির খসরু তাঁর 'সফরনামা' বইয়ে ৪৪৫ হিজরীতে পারস্য উপসাগর অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে সম্ভবত এই একই জিনিস বর্ণনা করেছেন।[৩]

তারার আকৃতি

আরব বালু-পাথরের দেশ, তাই অসহ্য গরম এবং উষ্ণ হাওয়ার জন্যে আরবরা রাত্রিবেলাতেই সফর করত এবং আসমানের নক্ষত্রই ছিল তাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। মরুভূমিতে দৃশ্যমানতা খুব স্বচ্ছ হয়; তাই তারা তারার আলোতে অজানা এলাকায় পথের সন্ধান করত। ইসলামের আবির্ভাবের আগে থেকেই তারা বিভিন্ন দেশের নামে তারার নামকরণ করেছিল, যথা, سهيل يمانى ইয়ামনের সোহেল, (অগস্ত্য) شعرى شاميه সিরিয়ার বড় কুকুর। তারার নাম, যথা: قطبين ধ্রুব নক্ষত্র, سهيل (সোহেল), فرقدين লঘু সপ্তর্ষি, شعرى (বড় কুকুর), بنات النعش সপ্তর্ষি মন্ডল ও ثريا। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ ইত্যাদি তারা কাব্যে ব্যবহার করত এবং তা দিয়ে সময় ও দিক নির্ণয় করত। তারার অনুসরণে তারা বিভিন্ন দেশের অবস্থান নির্ণয় করত। মারযুকী লিখিত এবং হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) থেকে প্রকাশিত الأزمنة و الأمكنة বইয়ে আরব জ্যোতির্বিদ্যার প্রচুর মালামাল পাওয়া যায়।

প্রথম দিকের তথ্যাবলী জাহেলিয়াত যুগের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আরবরা জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষ-চর্চায় উন্নতি করে এবং সেই জ্ঞান তারা সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজনে ব্যবহার করে। চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাশ্শারী লেখেন যে, আরব নাবিকগণের সঙ্গে কিছুসংখ্যক গাণিতিকও থাকতেন। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খ্রীস্টীয় ১০ম শতকে নৌ-চালনা বিষয়টি বিজ্ঞানে পরিণত

---

১. "কিতাবুল-বুলদান", পৃ. ৩৩৮ (লাইডেন সংস্করণ)।
২. ঐ, প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৩, (প্যারিস সংস্করণ)।
৩. "সফরনামা", পৃ. ১৩৫ (বার্লিন সংস্করণ)।

হয়েছিল; গাণিতিকগণ অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও তারার হিসাব করে দিক নির্ণয় করতেন।

৯ম শতকের বিখ্যাত নাবিক নজদের ইবন মাজিদ তাঁর الفوائد فی علوم اصول البحور বইয়ে সুকৌশল নৌ-পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু সংখ্যক বইয়ের একটি তালিকা তিনি দিয়েছেন; এগুলোর মধ্যে ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ এবং তারার আকার বিষয়ক বই ছিল। আবদুর রহমান সুফীর বই صور الكواكب -এর কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

> নাবিকগণের সুবিধার জন্যে আমি গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর নাম উল্লেখ করলাম, এগুলো ছাড়া কেউ দক্ষ নৌ-চালক হতে পারবে না। এই বইগুলো হল ঃ (১) كتاب المبادى والغايات مراكشى (২) كتاب التصاوير এতে বিভিন্ন তারকার ছবি, তাদের আকার, আনুপাতিক দূরত্ব, ডিগ্রী, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ সব উল্লিখিত আছে, (৩) كتاب اختصار (৪) زيج مرزا الغ بيگ بن شاه رخ (৫) টলেমীর "আলমাজেস্ট" (৬) زيج بتانى (৭) (মিসরে ব্যবহৃত) زيج ابن شاطرى مصرى (৮) আবু হানিফা দিনাওরীর বই, (৯) তফসীর বইসমূহ, (১০) আবদুল মাজিদ ইসমাঈল বিন ইবরাহীম রচিত منزيل الارتياب عن مشتبه الانساب (১১) ইয়াকুব হামাভী রচিত كتاب المشترك (১২) ইবন সাঈদ মাগরেবীর বইসমূহ, (১৩) ইবন হামাভীর ভূগোল (এতে নদী, সাগর, উপকূলভূমি, পাহাড়, খাল, বিভিন্ন দেশ ও শহরের বর্ণনা রয়েছে)। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বইয়ে উপসাগর, সাগর, নদী ও পর্বতের বর্ণনা, কিছু বইয়ে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের বর্ণনা এবং কিছু বইয়ে তারকারাজির বর্ণনা রয়েছে। আমি এই সব বই পড়েছি, রোমক মাস বিষয়ক বই রয়েছে, সেগুলোতে ফসল কাটার মওসুম এবং বছরের বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনাও রয়েছে।— (الفوائد পৃ. ৪৪ থেকে সংক্ষেপিত)

আরবরা যে তারাগুলোর সাহায্য সবচেয়ে বেশী নিত সেগুলো হল ঃ سهيل অগস্ত্য তারা, شعرى বড় কুকুর, (ইরানীরা বলে تير) قطب (ধ্রুব নক্ষত্র), ثريا (কৃত্তিকা), فرقدين (লঘু সপ্তর্ষি), بنات النعش (সপ্তর্ষি মণ্ডল), عيوق, ظفر, اكليل, سماك এবং ذنب। তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় রাশি ছিল কুম্ভ, মীন, কর্কট, মেষ, মিথুন এবং অন্যান্য স্থির গ্রহরাজি (الفوائد পৃ. ৪৬)।

আরব নাবিকেরা গ্রহ-নক্ষত্র চিনত আসতারলাব (astrolabe) ও অন্যান্য খুব সহজ যন্ত্রপাতির সাহায্যে। এ ছাড়া, নিজেদের হাতের তালু ভুরুতে রেখে তারা গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করত, কয়টি আঙুলে তারা ঢাকা পড়ল তা হিসাব করে তারা সেই বিশেষ গ্রহ বা নক্ষত্রের মোটামুটি দূরত্ব নির্ণয় করতে পারত। এসব পর্যবেক্ষণ তারা লিখে রাখত এবং মুখস্থ করে ফেলত। চতুর নাবিকেরা আসতারলাবও ব্যবহার করত। এ কারণেই ভাস্কো-ডা-গামার আরব পথ-প্রদর্শকের নিকট তাঁর চেয়েও উন্নত-মানের উচ্চতা নির্ণায়ক যন্ত্র ছিল, যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

দিকনির্ণয় যন্ত্র

কুতুবনুমা' হল চুম্বক যন্ত্র, এটি দিক-নির্দেশ করে। এই যন্ত্রের আদি ইতিহাস অজ্ঞাত, কিন্তু সবচেয়ে পুরানো লিখিত ইতিহাস অনুযায়ী আরব-রাই এর প্রকৃত আবিষ্কর্তা বলে দাবী করতে পারে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে (১১শ সংস্করণ) কম্পাসের ইতিহাস সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে সেটি অত্যন্ত ভ্রান্তিজনক। যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা যে আরবরা, এই সত্যটি গ্রহণ করতে উক্ত প্রবন্ধের লেখক যেন অনিচ্ছুক। তিনি বলেন ঃ

> কম্পাস যন্ত্রের আরবদের দেওয়া কোন নাম নেই, তারা এটিকে বলত বস্‌সোলা, যেটি হচ্ছে ইতালীয় শব্দ, তা থেকে বুঝা যায় যে, সেই যন্ত্র এবং যন্ত্রের নাম দু'টিই তাদের নিকট অপরিচিত ছিল।

কিন্তু শব্দের উপর নির্ভর করে তর্ক করা ভুল। ভূমধ্যসাগরের আরব নাবিকেরা কুতুবনুমাকে বলত 'কম্পাস' তা ইতালীয়দের কাছ থেকে শব্দটি ধার করেছিল বলে নয় ; বরং এ কারণে যে, প্রথমদিকে নামটি তারা সাগরের সেই নক্সাতে ব্যবহার করেছিল যাতে নদী, উপকূল ও দ্বীপসমূহ এবং সেগু-লোর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের নাম উল্লিখিত ছিল। পরবর্তীকালে তারা কুতুব-নুমার জন্যেও সে শব্দটি ব্যবহার করে। হিজরী ৯ম শতকে আরব সাগরের নাবিকরা এটিকে বলত دائرة (বৃত্ত) এবং بيت الابرة (কাঁটার ঘর)।

কুতুবনুমার সর্বপ্রাচীন উদাহরণ পাওয়া যায় ইদ্রিসীর (ওফাত ৫৪৯ হি.) ভূগোল বই-এ। তাঁর বই-এর এই অংশটুকু আমি দেখিনি কিন্তু বাউকার এবং মঁশিয়ে' লে বোঁ এটির উল্লেখ করেছেন। লে বোঁ বলেন ঃ

> এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, কুতুবনুমার (কম্পাস) জন্যে ইউরো-পীয়রা আরবদের নিকট ঋণী। চীনের সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ ছিল, কাজেই কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই এই আবিষ্কার ইউরোপে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল। ইউরোপীয়রা বেশ অনেককাল পরে এটির ব্যবহার

শিখে, কেননা, খ্রীস্টীয় ১৩শ শতকের আগে তারা এটির ব্যবহার জানত না, যদিও ইদ্রিসীর মতে আরবরা সচরাচরই এটির ব্যবহার করত।[১]

ইদ্রিসী ৪৯৪ হিজরীতে (১১০০ খ্রী.) স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং সিসিলীতে বসে ৫৪৮ হিজরীতে (১১৫৪ খ্রী.) তাঁর বই রচনা করেন। এর পরে আমরা "জাওয়ামী-উল-হিকায়াত" বইয়ের লেখক আউফীর বর্ণনা পাই। আউফী ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষে এবং ৭ম হিজরীর শুরুতে জীবিত ছিলেন। তিনি সুলতান ইলতুতমিশের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন এবং তাঁর বইয়ের শেষ অধ্যায়ে 'দুনিয়ার আজব জিনিস' চুম্বকের বর্ণনা করেন। সুলতান মাহমুদের ভারত বিজয়ের কালে সোমনাথ মন্দিরে চতুর্মুখী চুম্বকের আকর্ষণে শূন্যে ঝুলন্ত একটি মূর্তির বর্ণনা করে তিনি লেখেন :

> একবার তিনি নদীপথে সফর করছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ আসমানে মেঘ জমে উঠে, প্রবলবেগে হাওয়া বইতে থাকে এবং তুফান শুরু হয়ে যায়। নদী ফুলে উঠে, ঢেউ প্রবলবেগে গর্জন করতে থাকে এবং নৌকার যাত্রীরা কাতর কান্না শুরু করে দেয়। আমাদের পথ-প্রদর্শক মুয়াল্লিম পথ ভুলে গেলেন, কিন্তু তখন তিনি মাছের আকৃতির একখণ্ড লোহা বের করে একটি পাত্রভর্তি পানিতে রেখে সেটাকে ঘুরানি দিলেন। ঘুরতে ঘুরতে সেটি কেবলামুখী হয়ে থামল। তখন পথ-প্রদর্শক আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে নিয়ে গেলেন। পরে আমি সেটি সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি আমাকে বললেন যে, চুম্বকের স্বভাব হচ্ছে এই যে, একে লোহার সঙ্গে সজোরে ঘষলে লোহা চুম্বকত্ব লাভ করে আর সেই লোহা কেবলমুখী হয়ে থাকে। তখন আমি পরীক্ষা করে দেখলাম যে, তিনি যা বলেছেন তা ঠিক। (আযমগড়ের শিবলী একাডেমীতে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত)।

আউফী সম্ভবত ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরে সফর করে থাকবেন। কেননা একই বইয়ের অন্যত্র তিনি তাঁর সফর এবং ক্যাম্বেতে আসার কথা বর্ণনা করেছেন। কেবলা বলতে দক্ষিণ বুঝায়।

---

১. এই অংশটুকু লে বোঁ-র "সিভিলাইজেশন অব দি আরবস" বই-এর উর্দু অনুবাদ থেকে গৃহীত, (পৃ. ৪৪৪)। অনুবাদ করেছেন বিখ্যাত উর্দু লেখক সৈয়দ আলী বিলগ্রামী। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ১১শ সংস্করণ কম্পাস শীর্ষক প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য। বাউকারের উল্লিখিত অংশ পাওয়া যাবে হাল্লামের "মিডল এজেস" বই-এর ৩য় খণ্ডের ২য় অংশের ৯ম অধ্যায়ে।

আরও পরে হিজরী ৭ম শতকের মাঝামাঝিকালে মিসরীয় লেখক বাইলাক কাবজাকী তাঁর বইয়ে (كنز التجار في معرفة الأحجار) চুম্বকের এই ধর্মের কথা বলেছেন। তিনি ৬৮১ হিজরীতে (১২৮২ খৃষ্টা.) মারা যান। তাঁর এই বইটি তিনি উৎসর্গ করে যান হিম্‌সের বাদশাহ্ আল-মালিকুল-মনসুর নাসিরুদ্দীন ইবনুল মালিকুল মুজাফফর শাহকে (ওফাত ৬৮৩ হি.)।[১] এর পাণ্ডুলিপি প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। লেখক বলেন যে, চুম্বকায়িত কাঁটা কাঠের টুকরা বা জলজ উদ্ভিদের গায়ে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় পানিতে ভেসে থাকে। সিরীয়ার সাগর দিয়ে ত্রিপোলী থেকে আলেকজান্দ্রিয়া যাবার কালে তিনি এটির ব্যবহার দেখেছেন।

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

লোকে বলে যে, ভারত মহাসাগরের কাপ্তানগণ কাঁটা এবং ধাতুর টুকরার পরিবর্তে মাছের আকৃতির এক ধরনের লোহা ব্যবহার করে থাকেন। সেই মাছটি পানিতে ফেললে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে মাথা ও লেজ উত্তর-দক্ষিণমুখো হয়ে স্থির হয়ে থাকে। (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ১১শ সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮০)

আরো পরবর্তীকালে হিজরী ৮ম শতকের শেষ এবং ৯ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে মাকরিযী (৭৬৬—৮৪৫ হি.) তাঁর "খাতাত মিসর" বইয়ে এর উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ "অন্ধকার রাতে যখন দিক নির্ণয়ের জন্যে তারার সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয় না, তখন ভারত মহাসাগরের নাবিকগণ মাছের আকৃতির একটি পাতলা, ফাঁপা লোহার জিনিস ব্যবহার করেন। মাছটির মুখে এক টুকরো চুম্বক লাগিয়ে পানিতে রাখলে মাথা দক্ষিণ মেরুর দিকে এবং লেজ উত্তরমুখো হয়ে থাকে। এ হল প্রকৃতির এক আজব বিস্ময়। উত্তর-দক্ষিণ দিক জানতে পারলে তখন পূর্ব-পশ্চিম দিক সহজেই নির্ণয় করা যায়।……চারটি দিকের অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা স্থির করে তাঁরা বিশেষ দেশের অবস্থান এবং নিজেদের পথও স্থির করে থাকেন।" (মিসরীয় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯-৪০)

এই বর্ণনা আউফীর পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুতুবনুমার মানের সাত্যকারের উন্নয়ন সাধন করা শুরু হয় হিজরী ৯ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে। কুতুবনুমার কাঁটাটির পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে 'সাগরের সিংহ' নামে পরিচিত মাজিদ সাদীর পুত্র শিহাবউদ্দিন আহমদের লেখাতে

১. আবুল ফিদা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮, (মিসরীয় সংস্করণ অনুসারে)।

এবং হাদ্রামাউতের সুলায়মান মেহরীর লেখাতে। ইবন মাজিদ তাঁর কাব্যাকারে লিখিত বই 'কিবলাতুল ইসলাম'-এ লিখেছেন, "কেমন করে যে কোন অবস্থান থেকে কেবলার দিক নির্ণয় করা যায়"।[১] এই বইটি তিনি ৮৯৩ হিজরীতে রচনা করেন। তাঁর গদ্য রচনা 'আল-ফাওয়াইদ ফি উসুলুল বহর ওয়াল কাওয়ায়িদ'-এও তিনি কুতুবনুমার কাঁটার উল্লেখ করেছেন এবং তিনিই এটির আবিষ্কারক বলে দাবী করেছেন।[২] সুলায়মান মেহরীর (৯০০ হি.) ছোট পুস্তিকা 'তুহফাতুল-ফাহুল ফী ইলমুল-উসুল'-এও এর উল্লেখ রয়েছে (পৃ. ৫, ১৬০, ১৬১, প্যারিস সংস্করণ)।

নজদের ইবন মাজিদ তাঁর যে বইয়ে নিজেকে কুতুবনুমার আবিষ্কারক বলে দাবী করেছেন। সেখান থেকে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

> নৌ-চালনার জন্যে আমরা চুম্বক আবিষ্কার করেছি। এটি একটি বাক্সে রাখা হয় এবং বাক্সেই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে স্থাপন করা হয়। (ـلـ) (?) যে দুই অগস্ত্য তারার বিপরীত দিকে অবস্থিত সেই রহস্যের ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত কোন বইয়ে পাওয়া যেত না। এখন বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। কেউ যদি আগে জেনে থাকেন তাহলে তাঁর উপর কৃতিত্ব নেবার কোন ইচ্ছাই আমার নেই (পৃ. ৪৬)।

একই বই-এর অন্যত্র তিনি কাঁটার সন্দেহজনক ইতিহাস সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

> কেউ কেউ বলেন যে, কাঁটার বাক্সটি কেমন করে চুম্বকের গায়ে ঘষতে হয় তা দাউদ (আঃ) আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন। কারণ তিনি লোহা এবং লোহার গুণাবলী জানতেন। কেউ বলেন যে, এটি আবিষ্কার করেন খিজির (আঃ)। "আবেহায়াত" সন্ধান করতে করতে তিনি বাহার জুলমাত (بحر ظلمات)-এ প্রবেশ করেন এবং মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু সূর্য ডুবে যায় এবং তখন তিনি চুম্বকের সাহায্যে পথ আবিষ্কার করেন। কেউ বলেন যে, তিনি অলৌকিক আলোর সাহায্যে পথ খুঁজে বের করেন। চুম্বক হল এক ধরনের পাথর, এটা লোহাকে আকর্ষণ করে (পৃ. ২—৩)। এই বিবরণের আগে নিম্নলিখিত বর্ণনাটি রয়েছে ঃ "কিন্তু যে চুম্বকের সাহায্যে জাহাজ চালানো হয় এবং যা বাদ দিলে নৌ-চালনা বিদ্যা অসম্পূর্ণ থাকে, যে কাঁটাটি উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর দিক-নির্দেশ করে,

---

১. ابن ماجد مجموعه رسائل প্রথম খন্ড, পৃ. ১২৮, প্যারিস সংস্করণ।

২. ابن ماجد مجموعه رسائل পৃ. ৫, ২২, ২৭, ৪৬ ও ১২৮।

সেটি আবিষ্কার করেন দাঊদ (আঃ)" (পৃ. ১—৫)। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইবন মজিদ এটির ইতিহাস জানতেন না। মানুষ কেমন করে এটির জ্ঞান লাভ করেছে তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না, কিন্তু এটির ব্যবহার হয়েছে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত। তাহলে ইবন মজিদ নিজেকে এটির আবিষ্কারক বলে দাবী করছেন কেন? এমন হতে পারে যে, তিনি যন্ত্রটিতে কিছু অংশ সংযোজন করেছিলেন, অথবা এটির ব্যবহার সহজতর করেছিলেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুতুবনুমা ছিল মাছের আকৃতির, প্রাচীন চীনা কুতুবনুমার আকারের, কিন্তু এর কাঁটা, বাক্স, কাঁটা বসানোর স্থান ও বৃত্তের উল্লেখ একমাত্র ইবন মজিদের বইতেই পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয় যে, ওই জিনিসগুলো সম্ভবত ইবন মজিদ সংযোজন করেছিলেন। এক জায়গায় তিনি ভারত মহাসাগরের আরব নাবিকগণকে ভূমধ্যসাগরের মিসরীয় নাবিকগণের সঙ্গে এভাবে তুলনা করেছেন ঃ"মিসরীয়রা এটাকে বলে, 'সামীয়া' (سميا)। কারণ গভীর সমুদ্রে চলাচলকারী নাবিকদের ভাষা থেকে তাদের শব্দ আলাদা। তাদের নিকট যে কম্পাস তাতে রেখা টানা আর আমাদের কম্পাসে বত্রিশটি ঘর। আমাদের ترفات (?), زوام। এবং قياسات আছে, তাদের তা নেই। তাদের কলাকৌশল সবই আমাদের জানা আছে কিন্তু তারা আমাদের কলাকৌশল জানে না। তাদের জাহাজ নিয়ে আমরা ভারত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে যাই। বইয়ের তথ্য এবং অনুমান দুই থেকেই এর সমর্থন পাওয়া যাবে, কিন্তু ওদের বই বা অনুমান ক্ষমতা কোনটিই নেই, একমাত্র কম্পাস ছাড়া আর কোন জ্ঞানই নেই। কোন নির্ধারিত মাইলের দূরত্বও ওদের নেই। আমাদের পক্ষে ওদের সাগরে ওদের জাহাজ ব্যবহার করাটা একেবারে সহজ কাজ। ওদের কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল; কিন্তু পরে আমাদের জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তারা আমাদের তথ্যের ব্যাপকতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় এবং স্বীকার করে যে, নৌ-চালনায় আমরাই সুদক্ষ। সাগরের প্রান্ত থেকে প্রান্তে আমরা সহজে সফর করে বেড়াই, কারণ আমরা কুতুবনুমা অনুসরণ করে জাহাজ চালাই এবং কুতুবনুমাকে ভিত্তি করেই সব হিসাব করে থাকি। ওদের আছে শুধুমাত্র বাক্স; কিন্তু নির্ধারিত কোন হিসাব করে যে জ্ঞাত দূরত্ব অতিক্রম করবে তা তারা পারে না। কাজেই বাধ্য হয়ে তারা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়। (পৃ. ২—১৭)

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ভূমধ্যসাগরের নাবিকগণ কোন

এক ধরনের সাদামাটা জাতের কুতুবনুমা ব্যবহার করত এবং সঠিক দিক-নির্দেশ করার মত কোন কুতুবনুমা তাদের ছিল না। ১০ম শতকের শেষ দিকে শেখ মুহাম্মদ ইবন আবি আল-খায়ের নামক একজন যন্ত্র নির্মাণকারী النجوم الشارقات في ذكر بعض الصنائع المحتاج اليها في علم الميقات নামে একটি বই লিখেছিলেন, বইটি হালব থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটির ২১. ২২ ও ২৩ অধ্যায়ে যথাক্রমে চুম্বক বুঝতে পারা, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অবস্থান বুঝতে পারা ও সাধারণ ধরনের চুম্বক তৈরী করা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ২৪শ অধ্যায়ে বৃত্ত এবং দিকের অনুমান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে আবি আল-খায়র কোন রকম বিস্ময়, রহস্যময়তা বা বিমূঢ়তা ছাড়াই এই বিষয়গুলো বর্ণনা করে গেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, সে সময়ের মধ্যে বিষয়গুলো খুবই সুপরিচিত হয়ে গিয়েছিল।

কুতুবনুমা সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের এবং আরবদের প্রদত্ত বর্ণনা পড়ার পরে বলা যায় যে, এটি আবিষ্কার করে চীনারা এবং তারা এটিকে ব্যবহার করত সাধারণ গাণিতিক যন্ত্র হিসাবে। যেসব আরব নাবিক হিজরী ১ম শতকেই (৬ষ্ঠ খৃ.) চীনে পৌঁছেছিল তারা চীনাদের কাছ থেকে যন্ত্রটি আনে এবং সমুদ্রে দিক নির্ণয়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। তারা যন্ত্রটির উন্নয়ন সাধন করে; কিন্তু অন্যদের কাছে তা গোপন রাখে। পারস্য উপসাগর, আরব সাগর ও আবিসিনিয়া সাগরের আদি ইতিহাস পড়লে আমরা জানতে পারি যে, এ সাগরগুলোতে চলাচলকারী আরব জাহাজে লোহার পেরেক বা কাঁটা ব্যবহার করা হত না।[১] শুধুমাত্র ভূমধ্যসাগরে চলাচলকারী জাহাজেই লোহার পেরেক বা কাঁটা লাগানো হত। এ সাগর-গুলোতে চলাচলকারী জাহাজে প্রথম লোহার পেরেক ব্যবহার করেন ইরাক ও বসরার শাসক (৭৫—৯৫ হি.) হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ সাকাফী।[২] লোহার কাঁটা ব্যবহার না করার কারণ সম্বন্ধে মাসুদী লেখেন যে, সেগুলো পানিতে জং ধরে যেত।[৩] কিন্তু যাকারিয়া কাযওয়ানী (ওফাত ৬৮৬ হি.) বলেন, "লোহার কাঁটা যে ব্যবহার করা হত না তার কারণ চুম্বক পাহাড়ের আকর্ষণের ভয়"। মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ (আবির্ভাব ৭৫৩ হি) তাঁর نفائس الفنون في عرائس العيون বইয়ের একটি অধ্যায়ে খনিজতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন ঃ

১. "ট্রাভেলস অব সুলায়মান দি ট্রেডার", (প্যারিস সংস্করণ), পৃ. ৮৮।
২. ইবন রুশতাহ্, (লাইডেন সংস্করণ), পৃ. ১৯৬।
৩. "মুরুযুদ-দাহাব", (প্যারিস সংস্করণ), পৃ. ৩৬৫।

চুম্বক : এ ভূমধ্যসাগরে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট মানের চুম্বকের রঙ হয় গাঢ় কালো। আমি শুনেছি যে, এই সাগরে নাবিকেরা তাদের জাহাজে কোন লোহা ব্যবহার করে না। (আযমগড় শিবলী একাডেমীতে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি থেকে)।

উপরের বর্ণনা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আদি আরব নাবিকেরা তাদের জাহাজে লোহার পেরেক বা কাঁটা ব্যবহার করত না। কারণ তাদের ভয় ছিল যে, লোহা থাকলে আশ্চর্য চুম্বকের কার্যকারিতা থাকবে না। তাই তারা বিষয়টি গোপন করে রাখে, পরে ৬ষ্ঠ শতকে কিছু কিছু লোক এটির কথা জানতে পারে এবং দশম শতকে তা সর্বজনবিদিত হয়।

ইউরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে চুম্বক-কম্পাসের কথা জানতে পারে সম্ভবত ১৫শ শতকের পরে কিংবা তারও পরে। ১৫শ শতকের আগেই ইউরোপে 'কম্পাস' শব্দটির ব্যবহার ছিল বলে আমাদের বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই। কেননা তখন শব্দটি দ্বারা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের মানচিত্র বোঝাত। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার (১১শ সংস্করণ) "কম্পাস" প্রবন্ধটির লেখক ১৩শ শতকের ইউরোপীয় লেখকগণের লেখা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি প্রদান করে দেখিয়েছেন যে, সে সময়ে চুম্বকের কম্পাস প্রচলিত ছিল, কিন্তু যন্ত্রটির ব্যবহারের প্রমাণস্বরূপ তিনি কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন নি। তাঁর কিছু কিছু উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, মার্কোপোলো প্রাচ্য দেশসমূহ ভ্রমণ-শেষে দেশে ফিরে এসে যন্ত্রটি ইউরোপে প্রচলন করেন। কোন কোন উদ্ধৃতি থেকে আবার বোঝা যায় যে, ক্রুসেডের যুদ্ধে গমনকারী ফরাসী সৈন্যরা ইউরোপে এটির প্রচলন করেছিল।

অন্যান্য জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি

ধ্রুব নক্ষত্র ও অন্যান্য মেরু এলাকার নিকটবর্তী তারার উচ্চতা পরিমাপ করে তাদের অবস্থান ও গতি নির্ণয়ের জন্যে আরব নাবিকেরা আরো নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। সেসব যন্ত্রের বর্ণনা রয়েছে, প্যারিস থেকে পল গেথনার প্রকাশিত, নজদের ইবনে মাজেদের এবং সুলায়মান মেহরীর লেখা বইয়ে। বইগুলো সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিতগণের লিখিত সমালোচনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভাষার বাধার জন্যে সেসব সমালোচনা থেকে তথ্য গ্রহণ করতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত, তবে সেগুলোর মধ্যে একটি ইংরেজী প্রবন্ধও ছিল, সেটি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের জার্নাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রকাশিত হয়।

ভাস্কো ডা-গামার সময় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইউরোপীয় নাবিকেরা আরব নাবিকদের যন্ত্রপাতি এবং তাদের বিষয়ক বই থেকে তথ্যাবলী ব্যবহার করে আসছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার (১১শ সংস্করণ) 'কম্পাস' প্রবন্ধের লেখক বলেন; 'ও. সরি'ও থেকে আমরা জানতে পারি যে, গামার সময়ে আরবদেরকে নৌচালনা বিষয়ক এমন শিক্ষা দেওয়া হত যে, তারা নৌচালনার বিদ্যা ও বিজ্ঞানে পর্তুগীজ নাবিকদের কাছে হার মানত না। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের লেখক জেমস প্রিন্সেপ আরবদের ব্যবহৃত কামাল বিলিস্তি এবং অন্যান্য নৌচালনার যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। জনৈক আরব নাবিককে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে লেখা উক্ত প্রবন্ধটি তিনি এভাবে শুরু করেছেন ঃ

প্রত্যেক বছরই খুব ঘন ঘন আরব জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসে, এ পর্যন্ত আমি বহু পরিশ্রম করে, বহু রকম জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চেষ্টা করেছি যে, সমুদ্রে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের জন্যে তারা কি ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, সেসব তথ্যাবলীর সাহায্যে আমি ব্যারন ভন হ্যামার কর্তৃক অনূদিত "মুহিত" বইটির ব্যাখ্যা লিখব। এখন পর্যন্ত আমি চেষ্টা করে সফল হতে পারি নি। ইংল্যাণ্ডে তৈরী কোয়াড্র্যাণ্ট সেক্সটান্ট-এর আগমনে পুরানো জটিল যন্ত্রপাতি চাপা পড়ে গেছে। একজন মুয়াল্লিম আমার বর্ণনা শুনে যন্ত্রটি সঠিকভাবে চিনতে পারলেন বলে মনে হল—যদিও সেটির নির্মাণ পদ্ধতি তিনি বলতে পারলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বললেন যে, পরের যাত্রায় তিনি আমাকে একটি যন্ত্র এনে দেবেন। আমি 'ইজবা' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি দুই হাত প্রসারিত করে দিলেন এবং আঙুলগুলো একত্রে পাশাপাশি ধরে তাদের সাহায্যে গণনা করে ধ্রুব নক্ষত্রের উচ্চতা বের করে দিলেন। আমিও সে রকমই অনুমান করেছিলাম। আদি যুগের আরব নাবিকেরা ঠিক সে রকম সাদামাটা পদ্ধতিতেই নক্ষত্রের উচ্চতা পরিমাপ করত। অবশেষে মালদ্বীপের এক জাহাজে আমি একজন বুদ্ধিমান নাবিকের দেখা পাই, তিনি আমাকে সেই প্রাচীন যন্ত্রটি বের করে দেখান। সেটির সাহায্যেই তিনি কলকাতা যাতায়াতের রাস্তা নির্ণয় করতেন। যন্ত্রগুলো সাধারণের নিকট সুপরিচিত নয়, কিন্তু নিশ্চিত যে, সেগুলো আরবদেরই উদ্ভাবিত। নীচে আমি যন্ত্রগুলোর বর্ণনা দিলাম।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আরবরা নিম্নলিখিত বিদ্যাগুলোতে পারদর্শিতা অর্জন করত: (১) জ্যোতির্বিদ্যা, (২) অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের বিজ্ঞান, (৩) হাওয়ার প্রকৃতি, দিক ও মওসুম সম্পর্কীয় বিজ্ঞান, (৪) সাগরের উপকূলবর্তী বিভিন্ন স্থানসমূহ এবং সেগুলোতে বিভিন্ন ঋতুতে যে প্রভাব হয় তার জ্ঞান, (৫) বিভিন্ন দেশের বিস্তারিত ভৌগোলিক বিবরণ, যথা, বন্দর শহর ও দ্বীপের অবস্থান, বিপজ্জনক চর ও সরু নৌপথের অবস্থান, (৬) বিবিধ ভূ-পরিমাপক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, (৭) বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান এবং (৮) বিভিন্ন সৌর মাস ও দিন গণনার পদ্ধতি।

জাহাজের নাম

আধুনিককালের মত আরবদের যুগেও জাহাজের নাম দেওয়া হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকের নামে নামকরণ করা হত। ৩০৪ হিজরীতে মাসুদী যে জাহাজে ভ্রমণ করেন সেটির মালিক ছিলেন সিরাফের আবদুর রহীম ইবন জাফরের ভাই আহমদ ও আবদুস সামাদ। ইবন বতুতা যে জাহাজে করে চীনে গিয়েছিলেন সেটির নাম ছিল "জাগার"। সেটির মালিক ছিলেন ইব্রাহীম, তাঁর ভাইয়ের জাহাজের নাম ছিল منصورت।[১] আরো পরবর্তীকালে দিল্লীর মৌলভী রফিউদ্দীন যে জাহাজে করে সুরাট থেকে আরবে গিয়েছিলেন সেটির নাম ছিল "সফিনাতুর রসুল" (রসুলের জাহাজ)।[২]

১. ট্রাভেলস অব ইবনে বতুতা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০।
২. 'সফর নামা-ই-হারামাইন', মৌলভী রফিউদ্দীন, পাণ্ডুলিপি।

নয়

জাহাজ নির্মাণ কারখানা

আরবদের সমৃদ্ধির যুগে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল। এই কারখানাকে বলা হত দারুস্‌-সানা। পূর্বদিকে পারস্য উপসাগরের কূলে ওবুল্লা ও সিরাফে কারখানা ছিল। এখানে জাহাজের যে গা তৈরী হত সেগুলোতে ছিদ্র করে তারপর রশি দিয়ে একত্রে বাঁধা হত এবং তেল দিয়ে পালিশ করা হত। এ কারণে অন্যান্য বন্দর থেকে এই বন্দরগুলোর আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী কারখানাসমূহে জাহাজের গায়ে লোহার কাঁটা দিয়ে জোড়া লাগানো হত এবং সেই লোহা পালিশ করা হত কাঠ-কয়লা দিয়ে। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ সাকাফীই প্রথম ওবুল্লা ও সিরাফে নির্মিত জাহাজে লোহার কাঁটা ব্যবহার করান; কিন্তু এই অভিনবত্ব সম্ভবত জাহাজ নির্মাতাগণের খুব মনঃপুত হয়নি। কেননা হিজরী ৩য় শতকে সওদাগর সুলায়মান এবং ইবন ওয়াদিহ্‌ ইয়াকুবী বলেছেন যে, ওবুল্লা ও সিরাফে তৈরী জাহাজ চিরাচরিত নিয়মে রশি দিয়েই বাঁধা ছিল।[১]

উমাইয়ারা স্পেনের আশবীলিয়াতে একটি জাহাজ-নির্মাণ কারখানা গড়ে তোলে।[২] উত্তর আফ্রিকাতে জাহাজ নির্মাণের সদর দফতর ছিল তিউনিসে।[৩] সিনহাজার শাসকদের আমলে বিজায়াতে দুটি কারখানা ছিল। স্পেনের দানিয়াতেও একটি কারখানা ছিল।[৪] মরক্কোর সস-এ একটি বড় কারখানা ছিল। আরব শাসনামলে সিসিলীর পালার্মো বড় জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র ছিল। মেসিনা, সিসিলী এবং বারীতেও আরবদের জাহাজ কারখানা ছিল। সিরিয়ার উপকূলে অবস্থিত আক্কাতেও একটি কারখানা ছিল। পরে আব্বাসীয় আমলে সেটি সুর-এ স্থানান্তরিত করা হয়। সুলতান সালাহ্‌উদ্দীনের

১. "ট্রাভেলস অব সুলায়মান", পৃ. ৮৮; এবং "বুলদান", ইয়াকুবী, পৃ. ৩৬০।

২. "ফুতুহ্‌ উন্দুলুস", ইবনুল কুতাইবা, পৃ. ৬৭।

৩. "ইবন খালদুন", ২য় খন্ড, পৃ. ২১১ (মিসরীয় সংস্করণ)।

৪. "صفة الاندلس ইদ্রিসী", পৃ. ১৯২।

আমলে বৈরুত জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র ছিল। মিসরে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের জন্যে বহু কারখানা স্থাপিত হয়। মাকরিযীর (৭৬৫—৮৪৫ হি) মত অনুসারে ৫৪ হিজরীতে মিসরের রাউযাতে প্রথম জাহাজ কারখানা উদ্বোধন করা হয়। আব্বাসীয় আমলে আহমদ ইবন তুলুন এখানে একটি যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের কারখানা গড়ে তোলেন; কিন্তু আমীর মুহাম্মদ ইবন আখশাইদ (৩২৩—৩৩৪ হি.) এটি বন্ধ করে দেন এবং মিসরীয় উপকূলের ফুস্তাতে নতুন আরেকটি কারখানা স্থাপন করেন। ফাতেমী বংশের শাসক মুইজুদ্দীন (৩৬৫ হি) মিসরের মাকস্-এ একটি কারখানা স্থাপন করেন এবং সেখানে ৬০০ যুদ্ধজাহাজের তলা স্থাপন করেন। ফাতেমীদের আমলে কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া এবং দামিয়াত-এ জাহাজ কারখানা স্থাপিত হয়। ক্রুসেডের যুদ্ধের প্রয়োজনে সুলতান সালাহউদ্দীনকে জাহাজ-নির্মাণের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। মিসরের ফিয়ুম শহরের আয় তিনি এজন্যে ব্যয় করেন এবং ভানসা, ওয়ায়িদ, সাফ্‌ত রিশিয়ান, আশমনিয়ান, আসিয়ুতিয়া, আখমীমাহ্ ও কাউসিয়ার বনের কাঠ ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে মিসরের মামলুকদের আমলে রুকুনুদ্দীন বায়বারস আলেকজান্দ্রিয়া ও দামইয়াতে জাহাজ কারখানা স্থাপন করেন। ফাতেমিগণের আমলে সাগরে প্রায়ই নৌ-যুদ্ধের মহড়া অনুষ্ঠিত হত।

উদ্ধার কাজ

নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে আরবরা এতটুকু অগ্রগতি সাধন করেছিল যে, অনেক সময় তারা ডুবে-যাওয়া জাহাজও তুলে আবার ভাসাত। স্পেনের সুবিখ্যাত গাণিতিক ও চিকিৎসক আবুল সালত ইবন আবদুল আযীয (উমাইয়া) ৫১০ হিজরীতে মিসরে আসেন, সে সময়ে তামা বোঝাই একটি জাহাজ উপকূলের কাছেই ডুবে যায়। তখন রেশমী রশির মাথায় যন্ত্র বেঁধে তা পানিতে ফেলা হয় এবং ডুবুরীরা সেটা ডুবে যাওয়া জাহাজের সঙ্গে বেঁধে দেয়। যন্ত্রের সাহায্যে রশি দিয়ে জাহাজটি বাঁধা হয় এবং তারপর টেনে তোলা হয়। জাহাজটি পানির উপরে ভেসে উঠতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তখন ভার সহ্য করতে না পেরে রশি ছিঁড়ে যায় এবং জাহাজটি আবার তলিয়ে যায়। প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার কারণে আবুল সালতকে জেলে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সেই একই পদ্ধতি বর্তমানে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জাহাজ চালনাকারী নাবিকগণ

মাসুদীর বর্ণনা থেকে (৩০৩ হি.) আমরা জেনেছি যে, জাহাজে দুই শ্রেণীর কর্মচারী ছিল, উপরস্থ কর্মকর্তা এবং নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী, যাদেরকে

ভারত মহাসগরকে সম্ভবত বলা হত باناتيه (আজাইবুল-হিন্দ পৃ: ৮৫-৮৬)। ناخدا, رئيس ও ربان, শব্দগুলোর একই অর্থ; কিন্তু নাবিকদের বিভিন্ন বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, পরে শব্দগুলো দ্বারা বিভিন্ন অর্থ বোঝাত। ناخدا বা ناخوذه ছিলেন জাহাজের মালিক, তাঁর নিজের জাহাজে উপস্থিত থাকাটা কোন প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছিল না; ربان বা رهبان বলা হত কাপ্তানকে; ديدبان বলা হত তত্ত্বাবধায়কে; معلم ছিলেন মানচিত্র এবং নৌচালনার যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আর اشتيم বলা হত যাত্রীদের তত্ত্বাবধায়ককে। ইবন বাশ্শারী (৪র্থ-হি. শতক) জাহাজের নিম্নলিখিত কর্মচারিগণের নাম উল্লেখ করেছেন :

ربانيين বা কাপ্তানগণ, اشاتمد বা যাত্রিগণের তত্ত্বাবধায়কগণ, رياضيين বা অংকবিদগণ, وكلاء বা দালালগণ এবং تجار বা সওদাগর-গণ। أشاتمه হচ্ছে اشتيام-এর বহুবচন। লিসানুল আরবে আমরা পাই اشتيام رياضى رئيس لركاب, একে পরবর্তীকালে বলা হত معلم, বর্তমানে বলা হয় পাইলট বা পরিচালক।

জাহাজ নির্মাতা এবং নাবিকগণ

আরবরা প্রধানত দুইটি সাগরে চলাচল করত, পারস্য উপসাগর থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সাগর এবং আলেকজান্দ্রিয়া থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত সাগর। এই দুই সাগরে তারা দু'টি ভিন্ন জাতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরে তারা পারস্যবাসীদের সাহচর্যে আসে আর ভূমধ্যসাগরে আসে রোমক এবং গ্রীসবাসীদের সাহচর্যে; তারা আরবদের সঙ্গে বাণিজ্য এবং জাহাজ নির্মাণের কাজেও জড়িত ছিল। বাশ্শারী (৩৭৫ হি.) পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, জাহাজের সুদক্ষ লোক ও নাবিকদের অধিকাংশই ছিল পারস্যদেশীয়।

আমার বর্তমান মূল আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত অপর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে যদি সমালোচিত না হই, তাহলে এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, ভারতের গুজরাট থেকে সিন্ধু পর্যন্ত উপকূলভাগে যে পার্সী সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করেছে তারা হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে আসেনি; আরো শত শত বছর আগেই তারা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ভারতের উপকূলভাগে এসেছিল। হিজরী ৩য় ও ৪র্থ শতক পর্যন্ত তারা বাণিজ্য ও নৌ-চালনায় আরবদের

সহযোগী এবং অংশীদার ছিল। ইরানের জনসংখ্যার অধিকাংশই বাস করত পারস্য উপসাগরের কূলবর্তী ফারস প্রদেশে। আর সে এলাকাটা বরাবরই নৌপথে ভারতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। হিজরী ৪র্থ শতকে দাইলামীয়দের উদার শাসন শুরু হলে ইরানীরা উন্নতি করে, তখন এমন কি এডেন এবং জেদ্দাও তাদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। (ইসতাখারী, পৃ. ৮৯-৯৬)

যেসব আরব নাবিক মালাবার, মিসর ও আরবের মধ্যে নৌচালনা করত তারা স্থায়ীভাবে মালাবারে বসতি স্থাপন করে; বর্তমানে তারা 'মোপ্‌লা' নামে পরিচিত। মালাবার, মিসর ও আরবের বন্দরসমূহের শাসক এবং আমীরগণের দরবারে এইসব দুঃসাহসী নাবিকের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। হিজরী ১০ম শতকে পর্তুগালীয়গণ কর্তৃক স্থানটি দখল করার পূর্ব পর্যন্ত তাদের সে প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

আজ অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে, যে সকল দুঃসাহসী নাবিক নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সমগ্র বিশ্বের বাণিজ্য ও সভ্যতায় অবদান রেখে গেছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তাঁদের নাম মুছে গেছে। সেই উপকারী ব্যক্তিগণ, যাঁরা সাহস দ্বারা প্রাচ্য সাগরের উত্তাল তরংগ মালাকে বশীভূত করেছিলেন, তাঁদের নাম যদি আজ বিস্মৃতির অতলগর্ভ থেকে পুনরুদ্ধার করে আনি তাহলে নিশ্চয়ই তার জন্যে একটু ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য হব। সম্প্রতি পড়াশুনা থেকে যে সকল নাবিকের উল্লেখ পেয়েছি তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে দিলামঃ (১) সুলায়মান (২২৫ হি.) (২) সিরাফের আবুল হাসান আলী ইবন সাদান (২৫৫ হি.), (৩) আবুল যাহ্‌র বরখাতি (জাহাজের মালিক, ৩০০ হি.) (৪) আহমদ বিন আলী ইবন মুনীর (জাহাজের মালিক) (৫) মারোদিয়া ইবন যারা বখ্‌ত (ইনি চীন পর্যন্ত জাহাজ পরিচালনা করেছিলেন), (৬) কিরমানের আবহারা, (৭) শাহরিয়ারী, (ইনি চীনে গিয়েছিলেন), (৮) সিরাফের আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাবশাদ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন হামবিয়া (জাহাজের মালিক), (৯) ইমরানুল-আরজ, (১০) মর্দান শাহ্‌ (জাহাজের মালিক), (১১) আবদুল ওয়াহিদ, (১২) ইয়াবিদ ওমানী, (১৩) মুহাম্মদ ওমানী, (১৪) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জুনায়েদ, (১৫) জাফর ইব্‌ন রশীদ (ইনি ইব্‌ন লাকিস নামে সুপরিচিত ছিলেন,) (১৬) বুযর্গ ইবন শাহরিয়ার, (১৭) ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মারদাশ (৩১৭ হি.), (১৮) রশীদুল-গোলাম ইব্‌ন বাবশাদ (৩০৫ হি.)।

উল্লিখিত নাবিকগণের সবাই হিজরী ৩য় শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে একমাত্র সুলায়মানের নাম বাদে সবগুলো

নামই ইবন শাহরিয়ার কৃত 'আজাইবুল-হিন্দ' বই থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এঁরা পারস্য উপসাগর হয়ে চীন পর্যন্ত সফর করেন। এঁরা ছিলেন আদ গোত্রের লোক, এঁদের মধ্যে আবার জালিন্দী—আমা'রা নামেও খ্যাত—উপ-গোত্রীয়গণ ছিলেন সমধিক খ্যাত। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই গোত্রীয়রা পারস্য উপসাগরের কূলবর্তী ফারস্-এ বসতি স্থাপন করেন এবং ফারস্ থেকে কিরমানের চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করে নেন; উপকূলের বিভিন্ন স্থানে তাঁরা দুর্গও নির্মাণ করে। তাঁরা সাগরে পাহারা দিতেন এবং শুল্কও আদায় করতেন—(ইসতাখারী, পৃ. ১৪০-১৪১)।

ইরাকে মুযার এবং রাবীয়াহ্ গোত্র দু'টি দজলা ও ফোরাত উপত্যকায় বসবাস করত। মুজাফফর ইবন জাফরের বংশধরদেরও একটি বসতি ছিল ফারস্-এর উপকূলে। হানযালার বংশধরেরাও উমাইয়া আমলে বাহরাইন থেকে গিয়ে ফারস্-এ বসতি স্থাপন করে। খলীফা মামুন কুতারিয়ার বিরুদ্ধে একটি নৌযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্যে উমর ইবন ইবরাহীমকে নিযুক্ত করেছিলেন, এই কুতারিয়ার বংশধরেরা ফারস্-এর একটি অংশও শাসন করত। এই বংশেরই এক ব্যক্তিকে ইয়াকুব সাফফার গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন। আলী জহির মদনীর বংশধরেরা—যারা বনী সামাহ্ ইবন লোয়ারির উত্তরাধিকার দাবী করত, তারাও পারস্য উপসাগরের উপকূলে বসতি স্থাপন করেছিল। এই বনী সামাহ্ ইবন লোয়ারি গোত্রের কিছু লোক বাহরাইনে বাস করত, তারা ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে গিয়ে সিন্ধু জয় করে।[১]

সাধারণভাবে বলতে গেলে পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় এবং উপকূলে যথেষ্ট সংখ্যক আরব বসতি ছিল।

হিজরী ৪র্থ শতকের শুরুতে মাসুদী দুইজন অভিজ্ঞ নাবিকের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁদের একজন ছিলেন সিরীয় ত্রিপোলীর শাসক যারাফার ক্রীতদাস এবং অপরজন জালিয়ার আবদুল্লাহ্ ইবন ওয়াযির। জালিয়া ছিল সিরীয় ত্রিপোলীর হাম্সের একটি উপকূলবর্তী শহর। মাসুদী বলেন যে, ভূমধ্যসাগর সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে বেশী জ্ঞান আর কারো ছিল না এবং বৃদ্ধ নাবিকেরাও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন।[২]

অনুরূপভাবে, তিনি আবিসিনিয়া সাগরের নিম্নলিখিত নাবিকগণেরও নাম উল্লেখ করেছেন। এঁরা সকলেই ছিলেন সিরাফের বাসিন্দা এবং

১. ইসতাখারী, পৃ. ১৪২-১৪৩।
২. মুরূযুদ-দাহাব, প্যারিস সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২।

আনুমানিক ৩০০ হিজরীতে সিরাফ ও ওমান থেকে মাদাগাস্কার সফর করেন। মুহম্মদ ইবন যায়দ, আহমদ ইবন জাফর, আবদুস সালাম ইবন জাফর, আবদুর রহীম ইবন জাফর এবং জওহর ইবন আহমদ। এ'দের অধিকাংশই পানিতে ডুবে মারা যান। ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইসতাখারী সিরাফের নাবিকদের সম্বন্ধে লেখেন ঃ

> তাঁরা সারা জীবন জাহাজেই কাটাতেন। একজন ছিলেন যিনি চল্লিশ বছরের মধ্যে কোনদিন জাহাজ ত্যাগ করেন নি। এক জাহাজ ভেঙে গেলে তিনি আরেকটিতে গিয়ে উঠতেন—(পৃ. ১৩৮)।

ওমান থেকে মাদাগাস্কারগামী নাবিকেরা ছিল আযদ গোত্রীয় ওমানী।

উপকূলবর্তী এলাকার শাসকেরা এই নাবিকগণকে খুবই সম্মান করতেন, তাঁরা এদের কাছ থেকে নানা রকম উপকারও লাভ করতেন। জনৈক জাহাজ-মালিক মুহাম্মদ ইবন বাবশাদকে (এ'র পুরো নাম হল আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন বাবশাদ ইবন হারাম ইবন হামবিয়া সিরাফী) হিজরী ৩য় শতকের শেষ দিকে জনৈক হিন্দু রাজা সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং নিজে জাহাজের নাবিক ও খালাসী-সুখানিগণ পরিবৃত হয়ে একটি ছবি আঁকান। যে সকল আরব নাবিক কালিকট যাতায়াত করতেন তাঁদেরকেও অনুরূপ অভ্যর্থনা জানানো হত। বাহরাইন দ্বীপে বসবাসকারী আরব নাবিকগণের অসংখ্য জাহাজ-নৌকা ছিল বলে ভারতের রাজাগণ তাঁদেরকে বিশেষ সমাদর করতেন।

হিজরী ৪র্থ শতকের বিখ্যাত নাবিকগণের মধ্যে ছিলেন আহমদ ইবন তিরওয়াই এবং খাওয়াশির ইবন ইউসুফ ইবন সালাহুল ইরকাই (৪০০ হি.) এ'রা ভারতের দেওগড় পর্যন্ত জাহাজ চালনা করতেন।

হিজরী ৫ম শতকের নাবিকগণের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সুবিখ্যাত ছিলেন ঃ

মুহাম্মদ ইবন শাদান, সাহল ইবন আব্বান, লাইস ইবন কাহলান, আবদুল আযীয ইবন আহমদ মাগরেবী, মূসা কান্দ্রানী, মায়মুন ইবন খলীল, আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আবুল ফযল আবুল মুগাইরি এবং লাইস ইবন কাহলান। শেষোক্ত দু'জন ৬ষ্ঠ শতকেও জীবিত ছিলেন।

৮ম শতকে ছিলেন মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন ফযল ইবন দয়াক বিন ইউসুফ ইবন হাসান ইবন হোসেন ইবন আবি মুয়াল্লাক আল-সাদী ইবন আবিল বরকত নজদী এবং ইবরাহীম। এ'দের ছয়টি জাহাজ ছিল, সেগুলো গান্ধারা (ভারতীয় উপকূল) থেকে চীন পর্যন্ত যাতায়াত করত। এ আমলের

আরেকজন খ্যাতনামা নাবিক ছিলেন মুয়াল্লিম হাসান। ইনি না'দের (সম্ভবত রা'নদের, গুজরাট) থেকে আরব পর্যন্ত জাহাজ চালনা করতেন। না'দের-এর অদূরে এ'র কবরের গায়ে সন লেখা রয়েছে ৭২১ হিজরী। বর্তমানে তিনি মুয়াল্লিম পিন্টাস নামে আখ্যাত হয়ে থাকেন।

৯ম শতকের বিখ্যাত নাবিক ছিলেন মজিদ ইবন মুহাম্মদ ইবন উমর সাদী নেজদী, শিহাবউদ্দীন আহমদ সাদী ইবন মজিদ নেজদী, সুলায়মান আল-মাহরী প্রমুখ।

১০ম শতকের মাত্র দু'জন আরব নাবিকের নাম আমি পেয়েছি, তাঁরা হলেন মুয়াল্লিম হাবুত আল-মাহ্রী ও মুহাম্মদ আনসি। গুজরাটের সুলতানগণের শাসনামলের শেষ দিকে এ'রা আরব থেকে গুজরাট পর্যন্ত জাহাজ চালনা করতেন।[১]

তুর্কী-নাবিকগণের মধ্যে নিম্নলিখিতগণ সুপরিচিত ছিলেন ঃ

খায়রুদ্দীন বারবারোসা, পিয়ালে পাশা, তারগুদ (কাপ্তান), সালেহ্ (কাপ্তান), সাইয়েদী আলী (অ্যাডমিরাল) এবং পীরাই (কাপ্তান)।

ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের নৌ-পথ বন্দরসমূহ

সুলায়মান মাহরী তাঁর قلادة الشموس واستخراج قواعد الاسوس বই-এ ইরাক এবং আরব থেকে আগত জাহাজ যেসব দ্বীপ এবং বন্দরে ভিড়ত সেগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর বই-এর চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা নিম্ন-লিখিত দ্বীপ ও উপকূলসমূহের নাম পাই ঃ

যিলা (আফ্রিকা), সোমাল (আফ্রিকা). কুমার যারবান দ্বীপ, সোকুত্রা, কা'ল, দীপ (মালদ্বীপ) আন্দামান তা'জ বা'রী (নিকোবর), সিংহল, জাভা এবং শ্যাম-এর উপকূল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি নিম্নলিখিত বন্দরগুলোর নৌ-পথের উল্লেখ করেছেন —এগুলোর একটি থেকে আরেকটিতে যাতায়াত করা যেত ঃ

বাবেল মন্ডপ	সিবান
সিবান	জেদ্দা
সিবান	সিওয়াকিন
দিউ	দীপ (মালদ্বীপ)
চন্দপুর	এডেন
হানোর (করোমন্ডল)	এডেন

১. "আরব হিস্ট্রি ইন গুজরাট" জাফর আল-ওয়ালা, বি. মুজাফ্ফর-ওয়ালা পৃ. ২১৮, ২৫৭।

কালিকট	জারদ্পতন
দিউ	মালা'গা'
দিউ	সাতিজাম (চট্টগ্রাম)
সিওয়াকিন	এডেন
যিলা (আফ্রিকা)	গুজরাট
বারাহ্	গুজরাট
এডেন	গুজরাট
ফাশ্নে	গুজরাট
দাইবুল (থাট্টা)	দীপ
দিউ	মস্কট
খামবাইয়াত	এডেন
দাইবুল	এডেন
যাফার (ইয়ামন)	গুজরাট
কিলহাত	গুজরাট
এডেন	মালাবার
এডেন	হরমুয (পারস্য উপসাগর)
দিউ	মাশ্কোস
দিউ	শহ্র ও এডেন
মাহায়িম (বোম্বাই)	আরব
মালাগা	এডেন
সাতিজাম (চট্টগ্রাম)	আরব

আরব নৌবহরের ক্রমাবনতি

হিজরী ১০ম শতকে আরব নৌবহরের শ্রেষ্ঠত্ব শেষ হয়ে যায় এবং তার পর থেকে ভূমধ্যসাগরে উসমানীয়া তুর্কীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসরের মামলুক শাসকগণের জাহাজ লোহিত সাগরে চলাচল করত এবং উসমানীয়া তুর্কিগণ ইরাক ও মিসর অধিকার করার পর লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে তাঁদের বিজয়াভিযান পরিচালিত করেন। হিজরী ৯ম শতকে মিসরীয় মামলুকগণের মধ্যে খ্যাতনামা একজন নাবিক ফাওলাদ ইবন মুহাম্মদ তুর্কোমান একবার বাইশজন নাবিকসমেত ভারত মহাসাগরে জাহাজ চালনাকালে আরব নাবিকগণের নৌচালনার জ্ঞান দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।[১]

তুর্কীরা যখন ভূমধ্যসাগরের প্রভু, তখন ইউরোপীয় সওদাগরেরা এমন একটি নতুন নৌ-পথের সন্ধান করছিলেন যাতে ভূমধ্যসাগরে তুর্কী জাহাজের অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ এড়িয়ে প্রাচ্য দেশসমূহে যেতে পারেন। সেই নৌ-পথের সন্ধানে বের হয়েই কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন এবং ভাস্কো ডা-গামা আফ্রিকার নিম্নাঞ্চল পার হয়ে ভারতে পেঁছান।

পরবর্তীকালে পর্তুগালীয়রা, ওলন্দাজরা, ফরাসীরা এবং ইংরেজরা প্রাচ্যের নানা উপকূল এলাকাসমূহ দখল করতে থাকে। আরবরা দীর্ঘকাল যাবত পারস্য উপসাগর, মিসর, আরব, আবিসিনিয়া, আফ্রিকা, ভারত, চীন এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপসমূহের বাণিজ্য একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করে; কিন্তু ইউরোপীয় নাবিকগণের আগমনে আরব নৌযাত্রার অবনতি ঘটে। সমুদ্রে আরব আধিপত্য ধ্বংস করে দেবার জন্যে পর্তুগালীয়রা পরিকল্পিতভাবে প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি দ্বীপ ও উপকূলে আরবরা আধিপত্য হারায়। মিসরের মামলুক সুলতান সুলায়মান ও তুরস্কের সুলতান সেলিম পর্তুগালীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে পারস্য উপসাগর থেকে আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরে তাঁদের যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণ করেন। তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন গুজরাট ও বিজাপুরের শাসক এবং মালাবারের রাজা যামোরিন, কিন্তু প্রাচ্যের এই সম্মি-

১. "ফাওয়াইদ", ইবন মাজিদ, পৃ. ৪২।

লিত নৌবহর পশ্চিমের হানাদার বহরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়। ৯৩১ হিজরীতে (১৫০৭ খৃী.) মিসরের বাদশাহ মালিক আশরাফ কানসূ উপকূল এলাকায় পর্তুগালীয়দের সঙ্গে এক নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং ৯৪৫ হিজরীতে (১৫৩৮ খৃী.) কন্সটান্টিনোপলের সুলতান সুলায়মান গুজরাটের উপকূলে একটি নৌ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ব্যর্থ হন। এই পরাজয়গুলোর ফলে আরব নৌবহরের পতন ঘটে। যদিও এর পরে আরো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আরবদের সওদাগরী জাহাজ মাদ্রাজ এবং বাংলায় যাতায়াত করতে থাকে কিন্তু সেগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। এই ঘটনা প্রবাহের ফলে মালাবারে নতুন বসতকারী আরব অধিবাসীদের—যারা মোপলা নামে পরিচিত—নৌ-সম্মানেরও সমাপ্তি ঘটে। তাদের সমৃদ্ধি প্রধানত মিসর, আরব, ইরাক, মাদ্রাজ এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।[১]

১· উল্লিখিত নৌ-যুদ্ধগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে 'তুহ্ফাতুল-মুজাহিদীন' (মালাবারের ইতিহাস), 'রিয়াযুস-সালাতীন' (বাংলার ইতিহাস) ও 'যাফরুল-ওয়ালাহ' (গুজরাটের ইতিহাস) বই-এ।

আরব লেখকদের রচিত নৌ-চালনা বিষয়ক বই

জ্যোতির্বিদ্যা, হাওয়ার গতি, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ এবং ভূগোলসংক্রান্ত বিস্তারিত জ্ঞান আরবরা লিখিত আকারে রক্ষা না করে মনেই রাখত বেশী। নৌ-চালনার এই জ্ঞান-বিজ্ঞান পুত্র পিতা থেকে লাভ করত, পিতা তার পিতা থেকে। তদুপরি প্রত্যেক নাবিকের কাছে সমুদ্র, উপকূলবর্তী শহর-বন্দর এবং দ্বীপ নির্দেশক একটি মানচিত্র থাকত: ভূমধ্যসাগরের নাবিকেরা সেই মানচিত্রকে বলত 'কম্পাস'।[1] আর পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের নাবিকেরা বলত 'রাহনামা'।[2] এই রাহনামা আরবীতে হয় 'রহমানী'।[3] রাহনামা সংকলনের কাজই নৌযাত্রাবিষয়ক বই লেখার প্রেরণা হয়। ইবন মাজিদ ৫৮০ হিজরীর তারিখ সম্বলিত এবং লাইস ইবন কাহলার কর্তৃক লিখিত একটি রাহনামা দেখেন। তাতে মহাকাশ ও তারাবিষয়ক কাব্যাকারে রচিত একটি মসনবী ছিল। ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এই মসনবীর রচয়িতা বলে কথিত। রাহনামার আরো দু'জন রচয়িতা ছিলেন, একজন মুহাম্মদ ইবন শাদান এবং আরেকজন সাহল আববান। এই রাহনামা দু'টি শুরু করা হয়েছিল এই পবিত্র ছত্র দিয়ে: إنا فتحنا لك فتحا مبينا। কিন্তু সেগুলোতে কোন কবিতা বা স্থানের বিস্তারিত বর্ণনা ছিল না। ইবন মাজিদ-এর মাত্র একটি বই পেয়েছিলেন, বইটির শুরু ও শেষ অংশ ছেঁড়া ছিল, বইটি খুব নির্ভরযোগ্যও ছিল না। ইবন মাজিদ তাঁর 'আল-ফাওয়াইদ' বই-এ দুই কি তিনবার মুহাম্মদ ইবন শাদানের বই-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

এ থেকে বোঝা যায় যে, উক্ত বইটির কিছুটা গুরুত্ব ছিল। ইবন মাজিদ حاوية الاختصار-এর নিম্নে উদ্ধৃত কবিতায় লাইস ইবন কাহলান, মুহাম্মদ ইবন শাদান এবং সাহল বিন আব্বানের বইয়ের বিবরণ দিয়েছেন।

---

১. 'মুকাদ্দামাহ,' ইবন খালদুন, (প্যারিস সংস্করণ) পৃ. ৪৬ এবং 'আল-ফাওয়াইদ,' ইবন মাজিদ, পৃ. ২৭।

২, 'আল-ফাওয়াইদ' ইবন মাজিদ।

৩, ঐ।

ونظم تاليف ابن كهلان وسهل والليث بن ابان
ذوى النهى ومصاحين الشان زخرف ربى لهم الجنان

আরবী সাহিত্য সংক্রান্ত তথ্যাবলী কবিতা আকারে লেখা হত। নাবিকেরা তা মুখস্থ করত এবং তাদের কাছ থেকে অন্যেরা শিখত। বুযর্গ ইবন শাহরিয়ারের "আজাইবুল-হিন্দ" বইটি হিজরী ৪র্থ শতকের গোড়ার দিকে লিখিত। এতে প্রধানত নাবিকগণের কাহিনী এবং অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু মাসুদী তাঁর 'মুরুযুদ দাহাব' বই-এর ভূমিকাতে যে সব বর্ণনা প্রদান করেছেন তা খুবই নির্ভরযোগ্য। সম্ভবত হিজরী ৪র্থ শতকে জীবিত আহমদ ইবন তিরওয়াই নামক একজন নাবিকও নৌ-চালনা বিষয়ক কিছু বই লিখেছেন। খাওয়াশির ইবন ইউসুফ ইবন সালাহ উল ইরকী, যিনি হিজরী ৪র্থ শতকে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন—তাঁর লেখাও কোন একটি বই ছিল।[১] ৮ম ও ৯ম শতকে মুহাম্মদ ইবন উমর ও তাঁর ছেলে মাজিদ ভূমধ্যসাগর সম্বন্ধে দুই-একটি পুস্তিকা ও কাব্যাকারে বিবরণ রচনা করেন। মুহাম্মদ নাবিকগণের নিকট ربان البرين নামে পরিচিত ছিলেন। কাব্যাকারে রচিত তাঁর একটি বইয়ের নাম ছিল 'হিজাজিয়াহ্', এবং এতে এক হাজার শ্লোক বা পদ ছিল। ৯ম শতকে মাজিদের ছেলে আহ্মদ এবং ১০ম শতকে সুলায়মান মাহ্রী অসংখ্য বই এবং অন্যান্য রচনা লেখেন। সেগুলো তিন খণ্ডে ফরাসী ভাষায় সংযোজন সমেত ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। এগুলোর মূল পাণ্ডুলিপি ন্যাশনাল লাইব্রেরী, প্যারিসে রক্ষিত আছে।

নৌ-যাত্রা সম্বন্ধে আরব লেখকগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন 'সমুদ্রের সিংহ' নামে অভিহিত শিহাবউদ্দীন আহ্মদ ইবন মাজিদ। পঞ্চাশ বছরকাল সমুদ্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারপর তিনি الفوائد فى اصول علم البحر والقواعد বইটি রচনা করেন।[২] নৌ-যাত্রা বিষয়ে তিনি গদ্য ও পদ্যে পঁচিশখানা বই রচনা করেন। নীচে সেগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা গেল ঃ

১, আল-ফাওয়ায়িদ ফী-উসূল ইলমুল বহর ওয়াল কাওয়াইদ ঃ গদ্যে রচিত এই বইটির অধ্যায় সংখ্যা বারো। প্রথম দিকে নৌ-যাত্রার আদি ইতিহাস এবং চুম্বক কাঁটার বিষয় আলোচিত হয়েছে। লেখক তারপরে চন্দ্র সম্বন্ধে; কম্পাসের বত্রিশ ঘরের সংগে সংশ্লিষ্ট গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ; ভারত মহাসাগরের সমুদ্রপথসমূহ, এই মহাসাগরের এবং পশ্চিম চীন সাগরের

১, 'আল-ফাওয়ায়িদ', ইবন মাজিদ।
২, ঐ।

কিছু সংখ্যক বন্দরের দ্রাঘিমাংশ ; উপকূলের চিহ্ন বিভিন্ন পাখী অনুসরণ করে এলাকা চিহ্নিতকরণের উপায়, ভারতের পশ্চিম উপকূলের ভূমিধ্বস দশটি বড় এবং বিখ্যাত দ্বীপ (আরব উপদ্বীপ, কুমার বা মাদাগাস্কার, সুমাত্রা, জাভা, আল-গোর বা ফরমোজা, সিংহল বা শ্রীলংকা, জাঞ্জিবার, বাহরাইন, পারস্য উপসাগরস্থ ইবন জাওয়ান এবং সকোতোরা) ; পারসী হিসাব অনুযায়ী কোন্ মওসুমের কোন্ কোন্ তারিখ সমুদ্রযাত্রার জন্যে সুসময়, তার আলোচনা করেছেন। বইটির শেষ অধ্যায়ে লোহিত সাগরের বর্ণনা রয়েছে ; নোঙর করার বিস্তারিত বর্ণনা, অগভীর পানি এলাকা, তীরভূমি এবং প্রবাল প্রাচীর। লেখক বার বার কুতুবনুমার উল্লেখ করেছেন।

২০ حاوية الاختصار في اصول علم البحار : রাজায ছন্দে রচিত এই বইটি এগার অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে স্থল নিকটবর্তী হলে তা কোন কোন লক্ষণ থেকে বোঝা যায়—যে লক্ষণগুলো প্রত্যেক নাবিকেরই জানা থাকা উচিত ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে চান্দ্র মাস, তৃতীয় অধ্যায়ে আরবী, কপটীয়, বাইযেনটীয় এবং পারসী বৎসরের জ্ঞান ; চতুর্থ অধ্যায়ে কতগুলো তারকা বিষয়ক জ্ঞান (যথা : কোন্ মাসে সেই তারাগুলো দেখা দেয়, ঠিক কোন্ দ্রাঘিমাংশে অবস্থান করে এবং কোন্ সময়ে অদৃশ্য হয়ে যায়) ; পঞ্চম অধ্যায়ে আরব, হিজায, শ্যাম, আফ্রিকা, বারবারা উপসাগর ও সোমাল উপকূলের সমুদ্রপথের বর্ণনা ; ষষ্ঠ অধ্যায়ে পারস্য, হিন্দুস্তান, বাংলা, শ্যাম, মহারাজ দ্বীপ ও চীন উপকূলের সমুদ্র-পথের বর্ণনা ; সপ্তম অধ্যায়ে সুমাত্রা, লংকাদ্বীপ, মাদাগাস্কার, ইয়ামন, আবি-সিনিয়া, সোমালীদের দেশ, দক্ষিণ আরবের আল-আতওয়াদের দেশ এবং মেকরানের উপকূলভূমির সমুদ্রপথের বর্ণনা ; অষ্টম অধ্যায়ে পশ্চিম ভারতের উপকূলের সমুদ্র বন্দরসমূহ থেকে আরব উপকূলের সমুদ্র বন্দরসমূহের দূরত্বের বর্ণনা ; নবম অধ্যায়ে চতুষ্পার্শ্ববর্তী সাগর (بحر محيط) যে উত্তরের গভীর সাগরে, অর্থাৎ পশ্চিম ভারতের সাগরে পড়েছে তার বন্দর-সমূহের দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় ; দশম অধ্যায়ে বাস্তব নৌ-চালনা বিদ্যা অর্থাৎ গভীর সাগরের স্রোতের যথার্থ জ্ঞান এবং চতুষ্পার্শ্ববর্তী যে সাগর নিগ্রোদের দেশ, ভারত এবং চীনের উপকূলভাগের মধ্যবর্তী সুদূর সাগরে প্রবেশ করেছে তার স্রোতের যথার্থ জ্ঞান ; এবং একাদশ অধ্যায়ে নৌ-যাত্রা সংক্রান্ত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩০ ارجوزة المعربة : ৮৯০ হিজরীতে রচিত, কাব্যাকারে বর্ণনা ; বারবারা উপসাগর থেকে বাবেল মন্ডপ, আরব ও যিলার (আফ্রিকা) দূরত্বের পরিমাপ।

৪. قبلة الاسلام في جميع الدنيا : দুনিয়ার যে-কোন জায়গা বা সাগর থেকে কিবলার দিক নির্ণয় পদ্ধতি; কাব্যাকারে রচিত। লেখক এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভুল হওয়ার দাবী করেন। বইটির রচনা সন ৮৯৩ হিজরী।

৫. ارجوزة بر العرب : পারস্য উপসাগরের আরব উপকূল ধরে নৌ-চালনা বিষয়ক কাব্যাকারে বর্ণনা।

৬. ارجوزة في قسمة الجمة على النجم بنات النعش : সপ্তর্ষিমন্ডল ও লঘু সপ্তর্ষি সম্বন্ধে কাব্যাকারে রচিত বর্ণনা। রচনার সন ৯০০ হিজরী।

৭. كنز المعالمة : সমুদ্র যাত্রায় মুয়াল্লিম বা প্রধান কর্ণধারের সম্পদ এবং সাগর সম্বন্ধে অজ্ঞাত সব বিষয়, গ্রহ নক্ষত্রের ও তাদের মেরু-প্রদেশ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের রত্ন ভান্ডার।

৮. ارجوزة : ভারতের পশ্চিম উপকূলের এবং আরব উপকূলের ভূমিধ্বস সম্বন্ধে কাব্যাকারে বর্ণনা।

৯. ارجوزة مخمسة : উত্তর আসমানের কতগুলো তারকা সম্বন্ধে কাব্যাকারে বর্ণনা।

১০. ارجوزة مسبعة : উত্তর আসমানের অন্যান্য তারকা বিষয়ক আলোচনা।

১১. বাইযেন্টীয় মাস সম্বন্ধে সমিল তের ছত্রের কবিতা।

১২. নৌ-চালনায় কতকগুলো তারকার ব্যবহার বিষয়ক একটি কবিতা। কবিতার নাম : صريبة الضرائب ।

১৩. قصيدة مكية শীর্ষক একটি কাব্যাকারে বর্ণনা। আলোচ্য বিষয় জেদ্দা থেকে ফারতাক অন্তরীপ (দক্ষিণ আরব), কালিকট, দাইবুল, কোংকন, গুজরাট ও হরমুয পর্যন্ত সমুদ্র পথের বর্ণনা।

১৪. نادرة الابدال শীর্ষক একটি ছন্দোবদ্ধ পুস্তিকা।

১৫. ذهبية শীর্ষক একটি কবিতা। পানি থেকে উত্থিত প্রবাল পাহাড় শ্রেণী ও অত্যধিক গভীর সমুদ্রের অনুসন্ধান কাজ এবং সে সব স্থানে কি করণীয় তা, অগভীর সমুদ্র ও তীরভূমির পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নসমূহ। যথা : পাখী ও হাওয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে মৌসুমী বায়ু, প্রবাহের কালে অন্তরীপে ভূমিধ্বস, পশ্চিম থেকে বায়ু প্রবাহের কালে ভূমিধ্বস ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

উপরিউক্ত বইগুলো ছাড়াও আরো দশটি বই রয়েছে, সেগুলোতে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে, যথাঃ অগস্ত্য তারা ও স্বাতী নক্ষত্র দু'টি পর্যবেক্ষণ, ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানে সাগরের আওয়াজের তফাত, নৌ-চালনা বিদ্যার সাতটি শাখা, কোন্ কোন্ তারা প্রয়োজনীয়, ভূমিধ্বস অঞ্চলসমূহের বর্ণনা এবং দিন থেকে দাইবুল পর্যন্ত উপকূলভাগের বর্ণনা।

সুলায়মান মাহরী দশম শতকের প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা عــام لتــواريــخ-এ তিনি ভূমিকাতে সন লেখেন ৯০০ হিজরী এবং তাঁর বই العمدة المهرية-এর সন লেখেন ৯১৭ হিজরী। তাঁর লিখিত বইগুলো হচ্ছেঃ

১. قلادة الشموس في علم التواريخ : চান্দ্র, সৌর, বাইযেন্টীয়, কপটীয় ও পারসিক সনের পদ্ধতি ও বিস্তারিত আলোচনা এতে রয়েছে।

২. تحفة الفحول في تمهيد اصول : নৌযাত্রার জন্যে প্রয়োজনীয় জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যে বইটি রচিত। চার ছত্রের ভূমিকা, সাতটি অধ্যায় এবং উপসংহার, এই কয়ভাগে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মহাকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রের বর্ণনা; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃত্তের বিভাগসমূহ (নৌযাত্রার বিষয়াদির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞ নৌ-জ্যোতির্বিদগণ এই বৃত্তকে বত্রিশটি বিভাগে ভাগ করে থাকেন); তৃতীয় অধ্যায়ে সাগরের বুকে জাহাজ চালনা; চতুর্থ অধ্যায়ে দুই ধরনের নৌ-চালনা, উপকূলভাগ ধরে এবং গভীর সমুদ্রে; পঞ্চম অধ্যায়ে তারার উচ্চতা নির্ণয় করে তার সাহায্যে বন্দরের দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা; ষষ্ঠ অধ্যায়ে দুই বন্দরের মাঝখানের দূরত্ব নির্ণয় এবং সপ্তম অধ্যায়ে হাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহারে বলা হয়েছে যে, নৌ-চালনার দক্ষতা দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ভাল বুঝবার ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা। বইটিতে খুব ঘন ঘন বাংলার কথা, বাংলার বন্দর 'সাতিজাম' (চট্টগ্রাম) এবং মাদ্রাজ, গুজরাট ও সিন্ধুর কথা বলা হয়েছে। ইবন মাজিদ বাংলাকে 'বঙ্গ' বলে উল্লেখ করেছেন।

৩. العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية এটিঃ সুলায়মানের সর্বশ্রেষ্ঠ বই। বইটিতে সাতটি অধ্যায় রয়েছে, অধ্যায়গুলো আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে নৌ-যাত্রা সংক্রান্ত জ্যোতির্বিদ্যার বিষয় আলোচিত হয়েছে, যথাঃ বিভিন্ন ঘর, বিষুবরেখার উপরে গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব, তারা থেকে তারার দূরত্বের দ্রাঘিমাংশের পরিমাপ, একটিমাত্র বিশেষ সমতল থেকে যে সকল গ্রহ-নক্ষত্র সমান্তরালে দেখা যায় তা, সহ-সংঘটক বা গুণক-এর সংখ্যার জ্ঞান, যারা যে কোন অন্তরীপ পর্যন্ত নৌচালনায় কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং যার ফলে সোজা

উত্তরে যাত্রা করলে ঠিক সম পরিমাপের দ্রাঘিমাংশ অতিক্রান্ত হয়েছে বলে ধরে নিতে হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রহ-নক্ষত্রের নাম এবং অনুরূপ বিষয়াদী বর্ণিত হয়েছে। এ অধ্যায় দুই ভাগে বিভক্ত; (ক) উত্তর মেরু ধ্রুব নক্ষত্র, লঘু সপ্তর্ষি ও অন্য নক্ষত্রের মধ্যকার দূরত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং (খ) লঘু সপ্তর্ষি অবলম্বনে মেরুর চতুর্দিকস্থ বৃত্ত নির্ণয় পদ্ধতি। তৃতীয় অধ্যায়ে (ক) হিজাজের নৌ-পথ, (খ) আরবের দক্ষিণ উপকূল বরাবর নৌপথ, (গ) ভারতের উত্তর-পশ্চিম উপকূল বরাবর নৌপথ, (ঘ) বাবেল মণ্ডপ থেকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বরাবর নৌ-পথ, (ঙ) আরবের দক্ষিণ উপকূল থেকে খুরিয়া হয়ে সোকুত্রা পর্যন্ত নৌপথ, (চ) শ্যাম উপকূল থেকে মূল শ্যাম দেশের উপকূল, ইন্দোচীনের উপকূল পার হয়ে পশ্চিম চীন পর্যন্ত নৌপথের বর্ণনা। চতুর্থ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত দ্বীপসমূহের উপকূল ভাগ ধরে নৌপথের বর্ণনা ঃ

কুমার বা মাদাগাস্কার, যারিন বা সিচেলিস দ্বীপ, সোকুত্রা, ফাল বা লাক্ষাদ্বীপ, দীপ বা মালদ্বীপ, সিংহল বা শ্রীলংকা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ; শ্যাম, সুমাত্রা, জাভা, দক্ষিণ-পূর্বের দ্বীপসমূহ ইত্যাদি। পঞ্চম অধ্যায়ে ধ্রুব নক্ষত্র, লঘু সপ্তর্ষি ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের উচ্চতা অবলম্বন করে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের সাতটি ভাগে লোহিত সাগরের বন্দরসমূহ, আরবের পূর্ব উপকূলের বন্দরসমূহ এবং ভারতের পশ্চিম উপকূল, বঙ্গোপসাগর, সিংহল বা শ্রীলংকা, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি বন্দরসমূহের দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন মওসুম বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে নৌযাত্রা। অধ্যায়ের শুরু হয়েছে লোহিত সাগরের আরব ও আফ্রিকার উপকূলসংলগ্ন দ্বীপসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে। এর পরে নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহ ভ্রমণের সংক্ষিপ্তাতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে ঃ

বাবেল মণ্ডপ থেকে খুকুর পর্যন্ত এবং লোহিত সাগরের দক্ষিণে সাইবান পর্যন্ত; সাইবান থেকে জেদ্দা, সাইবান থেকে সাওয়াকিন; জেদ্দা থেকে এডেন; সাওয়াকিন থেকে এডেন; যিলা থেকে গুজরাট, বারবার থেকে গুজরাট; কিশিন থেকে গুজরাটের দক্ষিণ আরবীয় উপকূল; খালফাত থেকে গুজরাট; যুফার থেকে গুজরাট; কালহাত থেকে গুজরাট, মস্কট থেকে গুজরাট; কোঙ্কন ও মালাবার; এডেন থেকে মালাবার; এডেন থেকে হরমুজ; রাস আল-হা'দ থেকে দাইবুল; দিউ থেকে মসকস; দিউ থেকে শিহর ও এডেন; মাহাঈম (বোম্বাই) থেকে শায়েল (চাউল) এবং আরব উপকূলবর্তী এলাকাসমূহ; দিউ থেকে মালদ্বীপ এবং দাইবুল (সিন্ধু) থেকে মালদ্বীপ; দিউ থেকে মস্কট এবং হরমুজ; ক্যাম্বে থেকে এডেন; গোয়া চান্দাবুর থেকে

এডেন, হোনের ও বাদকাটা থেকে এডেন; কালিকট থেকে গুরোকান; দিউ থেকে মালাক্কা, দিউ থেকে বাংলা অর্থাৎ চট্টগ্রাম; মালাক্কা থেকে এডেন এবং চট্টগ্রাম থেকে আরব উপকূলে। উপসংহারে লেখক প্রত্যেক নাবিকের পক্ষেই বর্জনীয় সমুদ্রের এমন সাতটি বিপদের কথা উল্লেখ করেছেন।

৪. المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر বইটি ভূমিকা, সাতটি অধ্যায় এবং একটি উপসংহার অংশে বিভক্ত। ভূমিকা অংশে জ্যোতির্বিদ্যার পদ্ধতি এবং লেখক কর্তৃক গৃহীত ও অনুসৃত জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আরব, মেকরান, সিন্ধু, গুজরাট, কোংকন, তুলওয়ান ও মালাবার উপকূলের নৌপথ; সোমালী উপকূল ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের নৌ-পথ; হিন্দুস্তান, বাংলা, শ্যাম ও মালাক্কা উপকূলের নৌ-পথ; মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূল, ইন্দোচীন ও পশ্চিম চীনের নৌপথ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞাত ও জনবসতিপূর্ণ উপকূলের বন্দরসমূহের দ্রাঘিমাংশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞাত জনবসতিপূর্ণ বড় বড় দ্বীপসমূহের উপকূলভূমির বর্ণনা রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আরব থেকে পশ্চিম ভারত, বঙ্গোপসাগরের বন্দরসমূহ, আফ্রিকার পূর্ব-উপকূল এবং সুমাত্রা, জাভা ও বালি দ্বীপের কয়েকটি বন্দরের দূরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে জাহাজ যে সব সম্ভাব্য বিপদের সম্মুখীন হয়, যথা: হাওয়া, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি, সেগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে পশ্চিম ভারত আরব উপকূল ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের যমিনের চিহ্ন এবং অবতরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে রাশিচক্রের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্রের প্রবেশ সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে। উপসংহারে নিম্নলিখিত ভ্রমণপথের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে:

দিউ থেকে মালাক্কা, মালাক্কা থেকে মালদ্বীপ, দিউ থেকে সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত এবং সেখান থেকে ফিরে মার্তাবান, তেনাসেরিম ও বাংলা পর্যন্ত।

সুলায়মানের দুটি বই العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية ও المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر-এর ১০০৭ হিজরীর তারিখ যুক্ত চমৎকার দুটি পাণ্ডুলিপি পেশোয়ারের ইসলামিয়া কলেজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। تحفة الفحول-এর নাম পাওয়া যায় চালপীর كشف الظنون এ-ও।

আরব নাবিকগণ ছাড়া তুর্কী এবং ভারতীয় নাবিকগণও ইবন মাজিদ ও সুলায়মানের লেখা বইসমূহ থেকে উপকৃত হন। তুর্কী অ্যাডমিরাল সিদি আলী ভারত মহাসাগর ও গুজরাট উপকূলে পর্তুগালীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করার জন্যে আসেন। সে সময় দিল্লীর সম্রাট ছিলেন হুমায়ুন এবং গুজরাটের শাসক ছিলেন বাহাদুর শাহ। ইনি তুর্কী নৌ-চালনার রীতি ও দক্ষতা সম্বন্ধে 'মুহিত' শীর্ষক একখানি প্রমাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ইবন মজিদ ও সুলায়মানের বই থেকে প্রচুর মাল-মসলা গ্রহণ করেন এবং বইয়ের ভূমিকায় তাঁদের দু'জনেরই জ্ঞান ও কৃতিত্বের প্রশংসা করেন। 'মুহীত' বইটি বহু ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বোম্বাই জামে মসজিদের কুতুবখানায় সিন্ধি ভাষায় লিখিত নৌ-চালনার রীতিনীতি ও দক্ষতা বিষয়ক দু'টি বই রয়েছে। একটি বই কোন একটি আরবী বইয়ের ব্যাখ্যা, বইটির প্রথম দিককার কয়েকটি পাতা নষ্ট হয়ে গেছে। বইটির এখানে ওখানে আরবী শিরোনাম ও প্রবচন রয়েছে, যথা: ابعاد الكو اكب المشهورة عند الجمهور এবং ابعاد الشقاء عن نقطة الكره سبع وثمانون درجه বইটির স্থানে স্থানে ফার্সী বাক্যও রয়েছে। প্রত্যেকটি শিরোনাম লাল কালিতে লিখিত معرفت কথাটি দিয়ে শুরু হয়েছে। এক জায়গায় মুয়াল্লিম সুলায়মান সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে, اصبح قول معلم سليمان। বইটি সম্ভবত ১০৮৪ হিজরীতে লিখিত এবং এটিতে বিভিন্ন দ্বীপের নাম ও তাদের দূরত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। অপর বইটি মিশ্র ফার্সী ও সিন্ধী ভাষায় রচিত। এটিতে পূর্ণাংগ আলোচনা রয়েছে এবং বইটিও সম্পূর্ণ।

পাণ্ডুলিপির লেখক ছিলেন হিজরী চতুর্থ শতকের একজন মুসলমান নাবিক। তাঁর নাম ছিল মুয়াল্লিম এনায়েত ইবন মুয়াল্লিম শেখ ডা'কো। বইটির রচনার তারিখ লেখা নেই কিন্তু পাণ্ডুলিপি দেখে মনে হয় যে, এটি ১১৯৬ হিজরীর লেখা হবে। বইটিতে কিছু কিছু রোজনামচাও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

উপরিউক্ত সবগুলো বইতেই পারস্য উপসাগর, হিন্দুস্তান ও চীনের মধ্যবর্তী দ্বীপ ও উপকূলভূমি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ভূমধ্যসাগর এলাকায় নৌ-চালনা সম্বন্ধে সবচেয়ে জনপ্রিয় বই হল بحريه; ৯৬২ হিজরীতে তুর্কী ভাষায় রচনা করেন সুবিখ্যাত অ্যাডমিরাল পেরী ইবন হাজী মুহাম্মদ মকতুল। এই বইতে তিনি মানচিত্র সমেত ভূমধ্যসাগর, এই সাগরের দ্বীপসমূহ, বিভিন্ন পথ এবং বন্দর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ১০৩০ হিজরীতে বইটি লিখে তিনি সুলতান প্রথম সুলায়মানকে উপহার দেন। বইটির শুরুতে তিনি পৃথিবীর মানচিত্র এবং ভারত মহাসাগরের নাবিকগণের নৌ-চালনার নীতি পদ্ধতি ও আইন-কানুন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

সংযোজন

১. ইয়াকুতের 'মু'জামুল-বুলদান' বইয়ে, ইয়াকুবীর 'কিতাবুল-বুলদান'-এ (পৃ. ৩১৯), হামদানীর 'জাযিরাতুল-আরব'-এ (পৃ. ৫২,১১৯) এবং মাসুদীর 'মুরুযুদ দাহাব'-এ (পৃ. ৩৪) একটি বন্দরের বর্ণনা রয়েছে। আরবীতে স্থানটির নামের উচ্চারণ দেওয়া আছে غلافقة (গালাফিকাহ)। এটি ছিল ইয়ামনের একটি প্রাচীন বন্দর। এখান থেকে জাহাজ আবিসিনিয়া যেত। খলীফা আল-মামুনের আমলে ২০৪ হিজরীতে যুবায়েদ জনবসতি পূর্ণ হলে তখন এই বন্দরটি নৌ-চলাচলের কেন্দ্র হিসেবে সুবিখ্যাত হয়।

যুবায়েদ থেকে এর দূরত্ব ছিল ১৫ মাইল। ৩৩২ হিজরীতে যুবায়েদ ইবরাহীম ইবন যিয়াদের শাসনধীনে আসে, তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক জাহাজ ছিল। সে কারণেই এই বন্দরটি ইয়ামান থেকে হিজায পর্যন্ত বাণিজ্যিক নৌ-চলাচলের এক বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়। যুবায়েদের জাহাজে করে সাওদাগরগণ আবিসিনিয়া উপকূলে যেত। যেতে সময় লাগত তিন দিন। এর কারণ ছিল এই বন্দরের পর থেকে লোহিত সাগর ক্রমেই সরু হয়ে আসছিল। 'আহসানুত-তাকাসিম' (৩৭৫ হি)-এর লেখক বাশ্‌শারীর আমলে গালাফিকা (?) জনবহুল বন্দর ছিল।

২. ইয়াকুবীর 'কিতাবুল-বুলদান'-এর ৩১৯ পৃষ্ঠায় য়াইযাব (عيذاب)-এর উল্লেখ রয়েছে। এটি ছিল মিসর ও আবিসিনিয়ার মধ্যবর্তী লোহিত সাগরে আফ্রিকা উপকূলে অবস্থিত একটি প্রাচীন বন্দর ও ঘনবসতিপূর্ণ শহর। এডেন ও নিম্ন মিসর এলাকায় চলাচলকারী জাহাজ এখানে নোঙর করত।

৩. ইয়াকুবীর 'মু'জামুল-বুলদান' অনুযায়ী তাবরাকা (طبرقة) ছিল বারবারের দিকে বাজার নিকটবর্তী একটি উপকূলীয় সওদাগরী শহর। এখানে একটি বড় খাল ছিল, এই খাল দিয়ে জাহাজ তাবারাকা সাগরে বের হত।

৪. 'তারিখ ফতেহ, উন্দুলুস, ইবনুল-কুতিয়া' (মাদ্রিদ সংস্করণ, পৃ. ৫) বইতে স্পেনের গোয়াডাল কুইভার (وادى الكبير) নদীর তীরবর্তী বিখ্যাত শহর সেভীলের (اشبيلية) শহরের বিস্তারিত বর্ণনা

রয়েছে। স্পেন আরব অধিকারে আসার আগেই এ'টি একটি সমৃদ্ধশালী বন্দর ছিল আরব শাসনামলে কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় অধিবাসী এই বন্দর দিয়ে স্পেন আক্রমণ করে এবং বন্দরটির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। তৎকালীন আরব শাসক আবদুর রহমান ইবন হাকাম বন্দরটি পুনঃনির্মাণ করান। জাহাজ তৈরীর জন্যে এখানে একটি কারখানাও তৈরী হয়। সুসজ্জিত যুদ্ধজাহাজ এবং নৌ-সেনাদলও মোতায়েন থাকত। ফলে ২০৪ হিজরীতে বন্দরটির উপর আবার হামলা হলে তা খুব সহজেই প্রতিহত করা সম্ভব হয়।

৫. الاستبصار فى عجائب الامصار (ভিয়েনা সংস্করণ, ১৮৫২ খৃী. পৃ. ২০-২১) বইতে উত্তর আফ্রিকার উপকূলস্থ বন্দর বাজায়ার (بجايه) বর্ণনা রয়েছে। বন্দরটি তিন দিক থেকে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল। সিনহাজা শাসকগণের আমলে এখানে সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর স্থাপিত হয়। এখানে দু'টি জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল। আরবদের এক বড় সামরিক কেন্দ্র ছিল এ'টি। মিসর, ইয়ামন, হিন্দুস্তান ও চীন থেকে আগত জাহাজ এখান হয়ে চলাচল করত।

৬. দানিয়া (دانيه)। ইদ্রিসীর ভূগোল গ্রন্থ جغرافيه ادرس صفة افريقه والاندلس (পৃ. ১৯২)-এ এ'টির বর্ণনা রয়েছে। এ'টি ছিল স্পেনের বিখ্যাত বন্দর ও উপকূলবর্তী শহর। কারিগরদের অতি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টায় বন্দরটি নির্মিত হয়েছিল। এখান থেকে জাহাজ দূরপ্রাচ্যে যেত। এখানে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল। যুদ্ধ জাহাজও মোতায়েন থাকত।

৭. ইদ্রিসী ওয়াহরান (وهران) নামক অপর একটি স্পেনীয় বন্দরেরও উল্লেখ করেছেন। এ'টি আলমেরিয়ার বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল।

আবু উবায়েদ বকরীর (ওফাত ৪৮৭ হি.) বই مسالك و ممالك -এ অসংখ্য ছোট ছোট বন্দরের বর্ণনা রয়েছে। বইটি আংশিকভাবে كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقه والمغرب নামে প্রকাশিত হয়েছে।

———

ইফাবা-উ/৮৭-৮৮/৩৮৬৫/৫২৫০

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ